সাম্যবাদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-এর মুখপত্র ● দ্বিতীয় বর্ষ একাদশ সংখ্যা ● জুন-জুলাই ২০১৬ ● পাঁচ টাকা

পথেই আছে এসইউসি
পৃষ্ঠা ২

বুর্জোয়া গণতন্ত্র - অতীত ও বর্তমান
পৃষ্ঠা ৩

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বাম মোর্চার বিক্ষোভ
পৃষ্ঠা ৪

এ সমাজে শিক্ষকের মর্যাদা কোথায়
পৃষ্ঠা ৮

করবৃদ্ধির বাজেট জনজীবনে সংকট বাড়াবে

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী এক বিবৃতিতে আগামী অর্থ বছরের জন্য ঘোষিত বাজেটকে গণবিরোধী আখ্যায়িত করে বলেন, বাজেটে একদিকে নতি স্বীকার করে মালিকদের জন্য বিপুল কর ছাড়, পণ্যের দাম নির্ধারণে অবাধ লাইসেন্স, অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করার সুযোগ রাখা হয়েছে। আর অন্যদিকে কর বৃদ্ধি, ভ্যাটের আওতা বৃদ্ধি ও জনগুরুত্বসম্পন্ন খাতে অপ্রতুল বরাদ্দ প্রচলিত শোষণ-বৈষম্যের ধারাকে আরো তীব্র করে জনগণের জীবনে সীমাহীন দুর্ভোগ নামিয়ে আনবে।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, ভোটারবিহীন তথাকথিত নির্বাচনের মাধ্যমে অবৈধ এ সরকারের জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা নেই, একতরফা ও আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রণীত এ বাজেটে জনজীবনের সংকট নিরসনের কোনো পরিকল্পনা নেই। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের নামে শিল্প গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়ে একদিকে কৃষি জমি ধ্বংস ও বসতি উচ্ছেদের মাধ্যমে জনগণের জীবন-জীবিকা ধ্বংস, অন্যদিকে তথাকথিত কর্মসংস্থানের গালভরা বুলির আড়ালে দেশি-বিদেশি মালিকদের লুটপাট পাকাপোক্ত করে তোলা হচ্ছে। কৃষিখাতে বরাদ্দ খোদ কৃষকের কাছে পৌঁছানোর কোনো ব্যবস্থা নেই অথচ ফসলের ন্যায্য মূল্য না পাওয়া কৃষকের জীবনে কৃষির উপকরণের মূল্যবৃদ্ধি রোধসহ আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সামান্য ভরসার কোনো প্রতিফলন এ বাজেটে নেই।

তিনি বলেন, সরকার মেগা প্রকল্পের নামে যে বিপুল বরাদ্দের ঘোষণা দিয়েছে তাতে একদিকে মেগা দুর্নীতি যুক্ত অন্যদিকে তথাকথিত উন্নয়নের নামে সেতু, ফ্লাইওভার, যোগাযোগ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির তথাকথিত উন্নয়নের নামে জীবন ধ্বংসকারী এসব গণবিরোধী পদক্ষেপ নিয়ে আন্দোলনের মধ্যে গড়ে উঠা জন আকাঙ্ক্ষাকে চূড়ান্তভাবে অবজ্ঞা করা হচ্ছে। সরকার বিপুল অর্থ পাচার রোধ, পাচারকারীদের চিহ্নিত করে শাস্তি বিধান, খেলাপি ঋণ আদায়ের উদ্যোগ না নিয়ে অভ্যন্তরীণ ঋণের মাধ্যমে ঘাটতি পূরণের যে প্রস্তাবনা করা হয়েছে তা জনগণের উপর দায়ভার চাপানো এবং ধনী তোষণ ও অপরাধীদের ছাড় দেয়ার সামিল। তিনি এই গণবিরোধী বাজেট বাতিলের দাবিতে গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

দুর্বার গতিতে এগোচ্ছে গণতন্ত্রের শবযাত্রা!

শতাধিক মানুষের প্রাণ খরচ করে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন শেষ করলে সরকার। এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ তৃণমূল পর্যন্ত তার নিরঙ্কুশ কায়েমী স্বার্থ বিস্তৃত করার পরিকল্পনা সফল করলো। প্রায় সবক'টি ইউনিয়ন পরিষদেই আওয়ামী লীগ জিতেছে, খুব অল্প কিছু জায়গায় জিতেছে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী। ফ্যাসিবাদী শাসন পাকাপোক্ত করার জন্যই এবারের ইউ.পি নির্বাচন দলীয় প্রতীকে করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে দেশের কৃষক জনসাধারণকে আওয়ামী লীগ তার কব্জার মধ্যে রাখতে চেয়েছিলো। গ্রামের যে কায়েমী স্বার্থভোগী গোষ্ঠী সরকারের অনুগত থাকে, তাদেরকেই জোরপূর্বক নির্বাচিত করে গোটা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ করার পরিকল্পনাই আওয়ামী লীগ বাস্তবায়ন করলো।

কিন্তু নির্বাচন শেষ হলেও মৃত্যুর মিছিল বন্ধ হয়নি। একের পর এক হত্যাকাণ্ড চলছে। এক-দুদিন নয়, প্রতিদিনই লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের খবর পত্রিকায় আসছে। দেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির তৎপরতা ক্রমাগত বাড়ছে। আগে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে ধর্ম নিয়ে যারা লেখালেখি করতেন তারা মৌলবাদীদের টার্গেট ছিলেন। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বাউল, মন্দির-গীর্জা-মঠের পুরোহিত, এমনকি ইসলাম ধর্মের সুন্নী ব্যতীত অন্যান্য ধারার লোকদেরও হত্যা করা হচ্ছে। আই.এস, আনসারুল্লাহ বাংলা গ্রুপ ইত্যাদি ধর্মীয় জঙ্গী গোষ্ঠীগুলো হত্যার দায় স্বীকার করে বিবৃতি দিচ্ছে। কিন্তু তারা ধরা পড়ছে না। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের যে শিক্ষককে হত্যা করা হলো তিনি কস্মিনকালেও ধর্ম নিয়ে কিছু লিখেননি। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক কাজ কর্মের সাথে যুক্ত ছিলেন। নিজের গ্রামের বাড়িতে একটি গানের স্কুল চালাতেন। কতটুকু অসহিষ্ণু হয়ে গেলে, কতটুকু মধ্যযুগীয় চিন্তাভাবনা ধারণ করলে, কতখানি কূপমন্ডুক হলে এমন লোককে হত্যা করা যায়! ইসলামের আবির্ভাবের যুগে এই অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে ইসলামকে লড়তে হয়েছিলো। তখন আরবের পৌত্তলিকরা তাদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যায় বলে ইসলাম ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিলো। আর আজ ইসলামের নাম করে কতিপয় লোক সেই পৌত্তলিকদের মতই নিজেদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যা কিছু যায় তাকে জোরপূর্বক দমনের রাস্তায় নেমেছে। আর এক্ষেত্রে তারা কাজে লাগাচ্ছে পুঁজিবাদী সমাজের ভয়াবহ নিপীড়নে পিষ্ট, অপমানিত-অবমানিত যুবক-তরুণদের।

আবার যে কোনো হত্যাকাণ্ডকেই জঙ্গি আখ্যা দিয়ে সরকারের তরফ থেকে একভাবে দায় সারা হচ্ছে। কোনো তদন্ত নেই, অভিযোগ গঠন নেই, বিচার নেই। কিছু হয়ে থাকলেও তা করা হচ্ছে কোনোরকমে কাজ সারার জন্য। অথচ এই হত্যাকাণ্ডগুলো সুপরিকল্পিত। আর সাথে এই কথাও উড়িয়ে দেয়া যায় না যে, এসব হত্যাকাণ্ডের পেছনে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন এজেন্সি জড়িয়ে থাকার সম্ভাবনা আছে। দেশে যখন একটা অরাজক পরিস্থিতি থাকে, তখন বিভিন্ন শক্তিসমূহ তা থেকে ফায়দা নেয়ার চেষ্টা করে। হত্যাকাণ্ডগুলোর ব্যাপারে সরকারের নিরব ভূমিকাও এই প্রশ্নের উদ্রেক করে।

এইরকম একটা অরাজক পরিস্থিতির মধ্যে সংসদে খসড়া বাজেট প্রণীত হলো। বিশাল এই বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ ৯২,৩৩৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ এই ঘাটতির পুরোটাই পূরণ করা হবে গরীব-মধ্যবিত্ত মানুষের ওপর করের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে। এ জন্যই ভ্যাট বা মূল্য সংযোজন করের আওতা বাড়ানো হয়েছে। এতে পাউরুটি, হাতে তৈরি কেক, বিস্কুট, হাওয়াই চপ্পলসহ সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম বাড়বে। মজুররা-চাকুরিজীবীরা-খেটে খাওয়া মানুষরা রাস্তার চায়ের দোকান থেকে যা কিছু কেনে সেগুলোরও দাম বাড়বে।

অথচ এদেশে বর্তমানে কি ভয়াবহ দরিদ্রতা বিরাজ করছে তা ভাবাও যাবেনা। অভাবে পড়ে মানুষ নিজের কিডনী পর্যন্ত বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। সারা দেশের কথা দূরে থাক, এক জয়পুরহাটের কালাইয়ের ১৮ টি গ্রামেই ২০০ লোক কিডনী বিক্রি করেছেন। স্থানীয় ইউপি মেম্বারের ভাষ্য হলো, ওখানে গ্রামে গ্রামে ঘুরে এমন লোক পাওয়া কষ্টকর যার দুটো কিডনী আছে। কাজের খোঁজে গ্রামের লোক দালাল ধরে নৌকায় করে সাগর পাড়ি দিচ্ছে। এতে দল বেঁধে মারা পড়ছে কখনও কখনও। যারা *(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

ধানের ন্যায্য মূল্য না পেয়ে কৃষকদের প্রতিবাদ

ন্যায্য মূল্য বঞ্চিত বিক্ষুব্ধ কৃষকদের নিয়ে মহাসড়কে বস্তা বস্তা ধান ফেলে সরকারের গণবিরোধী অবস্থানের প্রতিবাদ জানালো বাসদ (মার্কসবাদী)। এ বছর কৃষকদের প্রতি মণ ধান উৎপাদনে খরচ হয়েছে ৮৫০-৯০০ টাকা, অথচ বাজারে প্রতি মণ ধানের মূল্য ৩৫০-৪০০ টাকা। ফলে কৃষক ধান বিক্রি করে উৎপাদন খরচ পর্যন্ত তুলতে পারছে না। সরকার মণ প্রতি ধানের মূল্য ৯২০ টাকা ঘোষণা করলেও তা কাগজে কলমে সীমাবদ্ধ। প্রতি বছর কৃষকের উৎপাদন ব্যয় বাড়লেও ফসলের ন্যায্য মূল্য না পেয়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছে কৃষক। নির্বিকার শাসকগোষ্ঠীকে ধিক্কার জানাতে বাসদ (মার্কসবাদী) এবং সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট বিক্ষুব্ধ কৃষকদের নিয়ে এ কর্মসূচির আয়োজন করে। ৩১ মে সকাল ১১টায় রংপুর নগরীর সাতমাথায় সমবেত হয় ভুক্তভোগী কৃষক ও ক্ষেতমজুররা। সেখানে বাসদ (মার্কসবাদী) জেলা সমন্বয়ক এবং সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের জেলা আহবায়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু'র সভাপতিত্বে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী) নেতা পলাশ কান্তি নাগ, কৃষক প্রতিনিধি আব্দুস সাত্তার প্রামাণিক, এমদাদুল হক বাবু, ওজিউলাহ্ মিয়া, নুর ইসলাম প্রমুখ।

ধানের ন্যায্য মূল্যের দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের সড়ক অবরোধ

সমাবেশে আনোয়ার হোসেন বাবলু বলেন, এখানে মুনাফাখোর মধ্যসত্ত্বভোগী-ব্যবসায়ীরা লাভবান হচ্ছে আর কৃষক বাম্পার ফসল ফলানোর পরেও ক্রমাগত লোকসানের শিকার হচ্ছে। ফলে এই কৃষকদের বাঁচাতে সরকারকে উৎপাদন খরচের সাথে ৩৩% মূল্য সহায়তা দিয়ে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ধান ক্রয় করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত ও বিক্ষুব্ধ কৃষক আব্দুস সাত্তার প্রামাণিক বলেন, সরকার শিল্পপতি-পুঁজিপতিদের নানা সুবিধা দিতে পারে, কিন্তু কৃষকদের ধানের ন্যায্য মূল্য দিতে পারে না। কৃষক এমদাদুল হক বাবু বলেন, ১ মণ ধান বিক্রি করে ১টা লুঙ্গি কেনার টাকা যোগাড় করতে পারি না। ফসল উৎপাদন করা কি আমাদের অপরাধ? সমাবেশ থেকে অবিলম্বে সরকার ঘোষিত ৯২০ টাকা মণ দরে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ধান ক্রয় এবং বর্ধিত ভূমি উন্নয়ন কর প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়। সেইসাথে কৃষক-ক্ষেতমজুরদের পুঁজিবাদী শোষণ-দুঃশাসন থেকে বাঁচতে ঐক্যবদ্ধ গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানান। এর আগে ৫ মে বেলা ১১টায় কাচারি বাজারে সমাবেশ শেষে জেলা *(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

গণতন্ত্রের শবযাত্রা

(১ম পৃষ্ঠার পর) কোনোরকমে অন্য দেশে পৌঁছাতে পারছে তারা অবৈধ শ্রমিক হিসেবে কম বেতনে, নামমাত্র মজুরিতে নিজের শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। দরিদ্র হতে হতে মানুষ কোথায় নেমেছে ভাবা যায়! তাকে আরও দরিদ্র করে দেয়া, রাস্তার ভিখিরিতে পরিণত করার জন্য এই বাজেট।

সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য জিনিসপত্রের উপর কর বাড়িয়ে দিয়ে এই বাজেটে শুল্ক প্রত্যাহার হবে তরল প্রাকৃতিক রাবার, হুইট ক্রাশার, ফ্লাই অ্যাশ, প্যারাফিন ওয়াক্স ইত্যাদি পণ্যের। সাধারণ মানুষ জানেওনা এগুলো কি কাজে লাগে। এতে বড় বড় শিল্পপতিদের মুনাফা বাড়বে।

কোনো পণ্য বা সেবার মূল্য নির্ধারণে সরকারের অনুমতি নিতে হয়। এবারের বাজেটে এ ব্যবস্থাটি তুলে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ এখন থেকে পণ্য বা সেবার মূল্য নির্ধারণে ব্যবসায়ীরা স্বাধীন। ব্যবসায়ীরাও বাজেটকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। আরও বেশি সুযোগ-সুবিধা কী কী দেয়া যেত তা নিয়ে দেন-দরবার করছেন।

ফলে এবারের বাজেট বরাবরের মতই জনস্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করার জন্য। গরীব-নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত মানুষের রক্তশোষণের জন্য। তাহলে মানুষের গন্তব্য কোথায়? কোথাও কি কোনো আশার খবর নেই?

সরকার বলছে, আছে। তারা দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার গল্প শুনিয়েছেন। তাতে মানুষের কী লাভ হয়েছে তারা তা বুঝতে পারেনি। আমরা জানি, বিশ্ব ব্যাংক মধ্যম আয়ের দেশ ঘোষণা দেয়ার ক্ষেত্রে যে সকল সূচক ব্যবহার করে তা দিয়ে জনগণের জীবন ব্যবস্থার উন্নতি বোঝায় না। ফলে জনগণ সেই একই জায়গায় আছে– সেই একই দারিদ্র, একই অনিশ্চয়তা, একই নিরাপত্তাহীনতা।

এ সকল কারণে সস্তা শ্রমের বিরাট ক্ষেত্র এই দেশ। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো তাই এখানে আসতে চায়। দেশের পুঁজিপতি শ্রেণীও তাদের সাথে কোলাবরেশনে বিরাট মুনাফার সম্ভাবনা দেখছে। তাই সবরকম আইন, সংবিধান, নিয়ম, ঐতিহ্য– সবকিছুকে পদদলিত করে আওয়ামী লীগকে আনা হলো। ক্ষমতায় এসে সে তাই পুঁজিপতিদের সেবায় তৎপর। ইতোমধ্যে ভারতের আদানি-আম্বানি গ্রুপকে শর্তহীনভাবে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের অনুমতি দেয়া হয়েছে, চট্টগ্রামে জাপানকে ইপিজেড করার জন্য বিশাল জায়গা দেয়া হয়েছে, চীনের সাথে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আধুনিকায়নের ব্যাপারে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে কর মওকুফ, স্বল্প মূল্যে গ্যাস, বিদ্যুৎ ইত্যাদির সুবিধা দিচ্ছে সরকার।

এসব ক্ষেত্রে ভারতের ভাগই বেশি। ভারতের তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের কারও সাথেই সুসম্পর্ক নেই। নেপাল ও শ্রীলঙ্কা তার প্রভাবের মধ্যে আর আগের মতো নেই। মায়ানমার চীনের সাথে বেশি সম্পর্কিত। একমাত্র বাংলাদেশই তার পুরোপুরি কব্জার মধ্যে। ভারত চীনের সাথে বিরোধের জেরে আমেরিকার সাথে হাত মিলিয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশকে সে ছাড়তে চায় না। সম্প্রতি বাংলাদেশ সফরে এসে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব এস. জয়শঙ্কর বাংলাদেশ, ভারত ও আমেরিকা একসাথে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই করবে কি'না এমন প্রশ্নের জবাবে বলেন, বাংলাদেশ ও ভারত একসাথে কাজ করছে। আমেরিকার ব্যাপার তিনি এড়িয়ে যান। এ ব্যাপারে মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সহকারি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিশা দেশাইয়ের মন্তব্য উল্লেখ করলে তিনি বলেন, 'এটা আমেরিকা বলেছে। আমরা তো বলিনি।' এতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ভারত বাংলাদেশকে তার প্রভাববলয়ের মধ্যে রাখতে চায়। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তার সংযোগ হলেও ভারতের মাধ্যমেই হোক তারা এটা চায়। এর মানে এই নয় যে, বাংলাদেশ ভারতের তাবেদার রাষ্ট্র হয়ে গেছে। বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা খাত আধুনিকায়নের জন্য চীনের সাথে চুক্তি করেছে। অন্যান্য দেশের সাথেও সে আলাদাভাবে সম্পর্ক রক্ষা করছে। সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের নিজেদের পারস্পরিক এবং অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর সাথে তাদের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে এ যুগের অন্যতম মার্কসবাদী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক, ভারতের এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)- এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন , "সাম্রাজ্যবাদ ও অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির পারস্পরিক ক্ষেত্রে এখনও equality এর কোনো স্থান নেই। এরা হয় একে অন্যকে তাঁবেদার করে, না হয় একে অন্যের তাঁবেদারে পরিণত হয়। সাম্রাজ্যবাদ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে ক্রমাগত প্রাধান্য বিস্তার না করে থাকতে পারে না। একে অন্যের প্রাধান্য নষ্ট করেই নিজের প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে। এর ফলে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী দেশগুলোর পারস্পরিক দ্বন্দ্বও অমোঘ নিয়মে বিরাজ করে।" আমেরিকা-ভারত সম্পর্কে কিংবা তাদের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই কথাটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

দেশের মানুষ ভেতরে ভেতরে ভীষণ ক্ষুব্ধ। কিন্তু জনতার এ বিক্ষোভ তার মানসিক জগতেই সীমাবদ্ধ। এটি এখনও সংগ্রামের মাধ্যমে লাখো জনতার সংগঠিত শক্তিতে পরিণত হতে পারেনি। কিন্তু শাসকশ্রেণীর প্রতি শুধু ঘৃণা ও বিক্ষুব্ধ মনোভাবই যথেষ্ট নয়। একে সংগ্রামী জনতার সংগঠিত শক্তিতে পরিণত করতে হবে। বিএনপি-জামাত কখনও এ কাজ করবে না। তাদের হাজার হাজার নেতা-কর্মী জেলে, অনেকেই গুম হয়ে গেছে- ব্যাপারটা শুধু এই বলে নয়। তারা সত্যিকার অর্থে কোনো গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য কোনোদিনই কাজ করেনি। করবেও না। কারণ তারা যখন ক্ষমতায় থাকে তখন তারাও একই প্রক্রিয়ায় শাসন পরিচালনা করে। তারা একই পুঁজিপতি শ্রেণীর দল। সাধারণ মানুষের দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলনের একমাত্র শক্তি বামপন্থীরা। তারাই একমাত্র পারে দেশের বুকে গণআন্দোলন গড়ে তুলতে। জনগণের মধ্যে এ বোধ নিয়ে যেতে হবে যে, বর্তমান রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার আইন-কানুনের মাধ্যমে সংশোধন ও নির্বাচন কিংবা বিভিন্ন সংস্কারমূলক উপায়ে তাদের এই সমস্যা-সংকট দূর হবে না। এটি দূর করতে গেলে বিপ্লবের মাধ্যমে এ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে হবে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন ইস্যুকে কেন্দ্র করে বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা জরুরি। এই ঐক্য বিষয়ে এ কথাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, "সম্মিলিত বামপন্থী মোর্চা গঠনের উদ্দেশ্য বা সার্থকতা জনতার উপর সমস্ত বামপন্থী দলগুলির সম্মিলিত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা নয়- পরন্তু সম্মিলিত আন্দোলন সংগঠনের মারফৎ বিচ্ছিন্ন ও খণ্ড-বিখণ্ড জনশক্তিকে একত্রিত করা এবং সাথে সাথে আন্দোলনের মারফৎ সেই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের আসল শ্রেণী চরিত্র, উদ্দেশ্য ও যোগ্যতা বিচার করিয়া লইতে জনসাধারণকে সুযোগ দান।"(ভারত থেকে প্রকাশিত, ভারতের এসইউসিআই পার্টির সাপ্তাহিক মুখপত্র 'গণদাবী' এর ১লা অক্টোবর ১৯৫৩ সংখ্যা থেকে)

কাজেই ফ্যাসিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে সারাদেশ জুড়ে জনগণের মধ্যে যে ঘৃণা ও অসন্তোষ এবং তাকে কেন্দ্র করে যে বিরাট আন্দোলনের সম্ভাবনা বিরাজ করছে- তাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। শুধু ঐক্যের জন্য ঐক্য নয়, ভোটে যাওয়ার জন্য ঐক্য নয়– কার্যকর গণআন্দোলনের জন্য ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। এছাড়া দেশের মানুষের মুক্তির অন্য কোনো উপায় নেই।

শূন্যে নেমেও পথেই আছে এসইউসি

গৌতম রায়

সম্প্রতি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন হয়ে গেলো। সেখানে বামপন্থী বলে পরিচিত সিপিআইএম ডানপন্থী কংগ্রেসের সাথে জোট গঠন করে নির্বাচনে অংশ নেয়। বামপন্থার মর্যাদা রক্ষায় ভারতের এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) পার্টি একক ভাবে এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এই নির্বাচনে তারা কোন আসন পায়নি, যেখানে গত নির্বাচনেও তাদের একজন এম.এল.এ ছিলো। একটি বিপ্লবী দলের মূল লক্ষ্য নির্বাচনে জেতা নয়, বিপ্লব করা। আদর্শের গৌরববোধ কেমন থাকলে নির্বাচনে হেরে গিয়েও রাস্তায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে লড়াই করতে পারে- কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক আজকাল' পত্রিকার ৬ জুনের এ রিপোর্টটি পড়লে বোঝা যাবে। কর্পোরেট হাউসের পত্রিকাও এ বিষয়টি না উল্লেখ করে পারেনি, কারণ পশ্চিমবঙ্গের লাখো-কোটি জনগণের চোখের সামনে এ একটি জ্বলজ্বলে সত্য ঘটনা। এ নির্বাচনে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) সাড়ে তিনলক্ষ ভোট পেয়েছে। কোন ব্যাকিং ছাড়া, মানি পাওয়ার ছাড়া, পেশী শক্তির ব্যবহার ছাড়া সবরকম বাধা ও প্রলোভন অতিক্রম করে একজন একজন মানুষের দেয়া ভোট মিলে এ সংখ্যা। আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে আমাদের দলের কর্মী-সংগঠক-নেতা সর্বোপরি দেশের বামপন্থী মনোভাবাপন্ন মানুষের জন্য শিক্ষণীয় হতে পারে ভেবে আমরা এ রিপোর্টটি প্রকাশ করলাম।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচনেও যে এসইউসি দলের জন্য বিধানসভার দরজা খুলে গিয়েছিল, জয়নগর কেন্দ্র থেকে জিতে ছিলেন সুবোধ ব্যানার্জি। ৭২-এও সিদ্ধার্থ রায়ের রিগিং নির্বাচনে মুর্শিদাবাদের হরিহর পাড়া থেকে জিতে বিধান সভার পাস পেয়েছিলেন দলের প্রার্থী। একবার তো তাদের সাতজন বিধায়ক ছিলেন। কিন্তু এবার ষোড়শ বিধানসভার দরজা একেবারে বন্ধ হয়ে গেলেও, কিছুমাত্র টলেনি এসইউসি'র মন। দুর্জয় ঘাঁটি কুলতলি, জয়নগরে হার হওয়ার পরে থমকে গিয়ে নিষ্কর্ম দুঃখশোক পালনের বদলে দলের নেতা কর্মীরা মেতে আছেন চিরাচরিত পার্টি কর্মসূচিতে। শ্যামবাজারে, হেদোরমোড়ে, ধর্মতলায়, গড়িয়াহাটে শিবদাস ঘোষের কোটেশন প্রদর্শন এবং কৌটো কালেকশন। গড়িয়া হাটলেকের সম্বৎসর নিস্ত রঙ্গ, মাপা ঢেউয়ের মতো সময় মেপে লেকে চলছে তরুণ বলশেভিক বিপ্লবী কমসোমলের রুটমার্চ। দিব্যি চলছে পার্টি কমিউনগুলিতে বহু এসইউসি দম্পতির সংসার। নিত্যদিন কর্মসূচিতে দুঃখশোকের সময় কোথা আবহমানকালের এসইউসি সমাজে। এবারের নির্বাচনে শেষ গড়েও শূন্য হয়ে গেছে জানার পর মুহূর্তের জন্যও কি দুঃখ পেয়েছিলেন প্রশ্নে অবাক হয়ে গত ২০১১ সাল পর্যন্ত জয়নগরের বিধায়ক দেবপ্রসাদ সরকারের জবাব, বিধানসভায় কোনও সিট পেল না জেনে বিপ্লবীর দুঃখ হবে কেন? তিনি তো জানেন লেনিন পার্লামেন্টকে কী নামে ডেকেছেন । ৯৯ বছর আগে লেনিন পার্লামেন্টকে যে ননপার্লামেন্টারিয়ান শব্দেই ডেকে থাকুন না কেন, সাত সাতবার সেই পার্লামেন্ট তথা বিধানসভার বিধায়ক দেবব্রতবাবুকে বিধান সভা কভার করা সাংবাদিক রাবি লক্ষণ জানেন মোটা কালো ফ্রেমের চশমা পরা হার জিরজিরে, ঊনবিংশ শতকের ফ্যাক্টরি চারটিস্টদের মতো আজ কোন্ কোন্ দপ্তরে দাবি তথা স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন তার কপি এনে হাজির করতেন। এখন ৮২ বছর বয়স্ক, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা সম্পাদক, পার্টি অফিসবাসী দেব প্রসাদ বাবু জানান, শূন্য হওয়ার খবর শুনে দুঃখের সময় কোথায়, এত আনন্দের খবর আসতে লাগল, প্রচুর নতুন ভোট আর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতেই দেড়হাজারের মতো নতুন কনট্যাক্ট, প্রায় সবটা সংশোধনবাদী দল সিপিএম, আরএসপি থেকে বিপ্লবী দল এসইউসিতে। বিধান সভায় শূন্য হয়ে গিয়ে এসইউসি'র কিন্তু এমন কোনও শপথ নেই যে সামনের নির্বাচনে এই দু'টি আসন পুনরুদ্ধার করে সাত আসনের রেকর্ড ভেঙে চোদ্দো হবে। তারপর ক্রমে ক্রমে পশ্চিমবঙ্গে এসইউসি সরকার হবে। দলের দিকটির দিকে দেখিয়ে রাজ্য সম্পাদক সৌমেন বসুও জানান , যতক্ষণ শাসকশ্রেণী নির্বাচন প্রক্রিয়া চালু রাখবে এসইউসি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে যাবে। কিন্তু তার উদ্দেশ্য অন্য পাতি বুর্জোয়া দলগুলোর মতো নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল নয়। বরং নির্বাচনী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে এসইউসি'র বার্তা ছড়িয়ে দিয়ে বিপ্লবীদের দলে টেনে আনা। বিষয়টি আরও পরিষ্কার করে দিয়ে সৌমেন বাবু জানান, বিধায়কের সংখ্যা দিয়ে বিপ্লবী দলের বিচার হয় না। সিপিএম তো নিজেকে বিপ্লবী দল বলে, এতদিনে এত বিধায়ক পেল, বিপ্লব করতে পারল! বরং দিন দিন ছোট হয়ে যাচ্ছে। আর এসইউসি বৈপ্লবিক এলিমেন্টের দিক থেকে বড় হচ্ছে, আমরা এই নির্বাচনে সিপিএম কংগ্রেসের দোসর হওয়ায় সেদল ছেড়ে চলে আসা প্রচুর নতুন কনট্যাক্ট পেয়েছি। এখন রাত দিন খেটে এঁদেরই বিপ্লবী দল এসইউসিতে টেনে আনাই প্রধান কাজ। তাঁদের খুঁজে বাড়ি গিয়ে আলাপ করে রাজ্য কমিটিতে রিপোর্ট করতে হবে। যে তৃণমূলের কাছে নির্বাচনে হেরে এসইউসি শূন্য হয়ে গেল তার ওপর কিন্তু রাগ খুব নেই। যত রাগ সিপিএমের ওপর? মিডিয়ার সঙ্গে মিলে সিপিএম যে আবার আসছি বলল সেই ভয়েতেই তৃণমূলের পালে হাওয়া লেগে গেল। এসইউসি তো সিপিএমকে ঠেকাতে পারবে না। জানান রাজ্য সম্পাদক সৌমেনবাবু।

ওই অঞ্চলেই সিপিএমের হাতে ১৬০ জন এসইউসি কর্মী খুন হয়েছেন, মিথ্যা মামলায় বিধায়কের জেল হয়েছে, এখনও ২৫ জন লাইফার (যাবজ্জীবন) খাটছেন। আর গত পাঁচবছরে তৃণমূলের সঙ্গে সংঘর্ষ? না তেমন সংঘর্ষ কিছু হয়নি। বিধায়ক সংখ্যা শূন্য হয়ে যাওয়ায় দুঃখের খোঁজ কিছু পাওয়া গেল উত্তর কলকাতার গণেন্দ্র মিত্র লেনের এসইউসি কমিউনে। সেখানকার আবাসিকদের মধ্যে যুব সংগঠন ডিওয়াইওর রাজ্য সম্পাদক নিরঞ্জন নস্কর ছিলেন কুলতলির দায়িত্বে। হারের পরদিনই ভোরবেলা তিনি রওনা দেন। হাজির হয়ে দেখেন সাধারণ সমর্থক ভোটার, মানে অপরীক্ষিত কমরেডরা একটু ভেঙে পড়েছেন। কিন্তু এসইউসি'র মতো বিপ্লবী পার্টির ভোটারদের হারে ভেঙে পড়তে নেই বোঝানোয় তাঁরা বুকে বল ফিরে পান। শূন্য আসনেও যে কত মনোবল তা বোঝাতে আর একজনের কথা বলছিলেন কমিউনের সবাই। সঞ্জিতবিশ্বাস, বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠনের সংগ্রামী নেতা। রোগে ন্যুব্জ, হাসপাতালই যাঁর ঘরবাড়ি। অথচ আপনার বিদ্যুতের বিল যাতে আর না বাড়ে তার জন্য পুলিশের সঙ্গে হাতাহাতি লড়া একজন স্ট্রিট ফাইটার। সংবাদপত্রের পাঠকমাত্রই তাঁকে সেভাবেই চেনেন। দলের অমন হারেও ভেঙে না পড়ে ফল প্রকাশের পরদিনই হবু মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি দিয়ে এসেছেন।

বুর্জোয়া গণতন্ত্র - অতীত ও বর্তমান

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছু বিষয়ে বিচার বিভাগের সাথে সরকারের মতানৈক্য দেশের শিক্ষিত সচেতন মানুষের মধ্যে বিভিন্ন প্রশ্নের উদ্রেক করেছে ও তা নিয়ে তারা নানারকম মতামত দিচ্ছেন, তর্ক-বিতর্ক করছেন। বর্তমান সরকার দেশের বৃহৎ পুঁজিপতিদের সমর্থন নিয়ে অগণতান্ত্রিক অন্যায় প্রক্রিয়ায় ক্ষমতায় এসেছে এবং তার অন্যায় শাসন পাকাপোক্ত করতে সে সংসদ, প্রশাসন ও বিচার বিভাগকে সরকারের প্রধান নির্বাহীর একেবারে কর্তৃত্বের মধ্যে নিয়ে এসেছে। বর্তমান এই পরিস্থিতির ব্যাপারে সকলেই অবগত। আইনের শাসন বলে বাস্তবে কিছু এদেশে নেই। বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা বরাবরেরই মতই প্রশ্নবিদ্ধ। প্রশাসন বিরোধীদের নিঃশেষ করে দিতে তৎপর আর সংসদ একের পর এক জনগণের উপর দমনমূলক ও জনঅধিকার হরণকারী আইন তৈরিতে ব্যস্ত। কিন্তু ইদানিংকালে কয়েকটি বিষয়ে বিচার বিভাগের সাথে সরকারের দ্বন্দ্ব দেখা যাচ্ছে। এটা এই কারণে যে, ইউরোপের নবজাগরণের চিন্তাসমূহ এদেশে মানুষ অনুশীলন না করলেও একাডেমিকভাবে যে অন্ততঃ জেনেছিলো; ব্যক্তিস্তরের মানুষের মধ্যে, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে, আইনজীবীদের মধ্যে, বিচারপতিদের মধ্যে, চিকিৎসকদের মধ্যে– সেই চিন্তার প্রভাব ও তার কিছু রেশ এখনও দেখা যায়। এই রেশটা এখনও আছে বলে মাঝে মাঝেই ব্যক্তির সাথে ব্যবস্থার দ্বন্দ্ব বাঁধে। বুর্জোয়া শ্রেণী বর্তমানে টিকে থাকার প্রয়োজনে যখন সমাজের সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করছে, তখন সেই প্রশ্নে ব্যক্তির সাথে মাঝে মধ্যেই ব্যবস্থার দ্বন্দ্ব বাঁধছে। অর্থাৎ ব্যক্তি যখন নবজাগরণের সেই চিন্তা কিছুটা অর্থে ধারণ করে একটা অন্যায়, অসংগত কাজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়, তখন ব্যক্তি বুর্জোয়ার সাথে বুর্জোয়াদের যে শ্রেণীস্বার্থ তার দ্বন্দ্ব বাঁধে। মনে রাখতে হবে, বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ভিত্তির সাথে তার উপরিকাঠামো অর্থাৎ মানুষের চিন্তা-ভাবনার দ্বন্দ্ব সবসময়ই থাকে। সেই প্রশ্নে দেখা যাবে যে, একজন বিচারপতি যিনি একদিন একাডেমিকভাবেই বিচারের নিরপেক্ষতার ধারণা পেয়েছিলেন, কোনো একটা বিষয়ে সেটার পক্ষে দাঁড়িয়ে গেলেন। জনস্বার্থের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এরকম কিছু মানুষ কখনও কখনও দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষ করে বিচারকদের মধ্যে আইনের নিরপেক্ষ প্রয়োগকে কেন্দ্র করে এবং ডাক্তারদের মধ্যে বুর্জোয়া মানবতাবাদের মানবসেবামূলক ধারণাকে কেন্দ্র করে এরকম ঋজুভাবে হঠাৎ দাঁড়িয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত মেলে। সাধারণভাবে বুর্জোয়া সমাজের যে দমন-পীড়ন সেটাই চলে, কিন্তু মাঝে মাঝে এরকম কিছু ঘটনা বুর্জোয়া সমাজের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব সেটাকে সামনে নিয়ে আসে।

বুর্জোয়া রাষ্ট্রে বিচার বিভাগ এই শ্রেণীবিভক্ত রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে

সরকারের সাথে বিচার বিভাগের দ্বন্দ্বটি প্রকাশ্যে এসেছে প্রধান বিচারপতি এস.কে সিন্‌হা এবং সুপ্রীম কোর্টের সদ্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এইচ.এম শামসুদ্দিনের মধ্যকার তর্ক-বিতর্ককে কেন্দ্র করে। বিতর্কের বিষয় ছিলো বিচারপতিদের অবসরে যাওয়ার পর রায় লেখার ব্যাপারে প্রধান বিচারপতির মন্তব্যকে কেন্দ্র করে। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কতিপয় সংসদ সদস্য সংসদে প্রকাশ্যে প্রধান বিচারপতিকে উদ্দেশ্য করে রীতিমত হুমকি উচ্চারণ করেন। এরপর ৫ জানুয়ারির নির্বাচন নিয়ে করা একটি রিটের রায়ে আদালত সে নির্বাচনকে আইনত বৈধ ঘোষণা করেন কিন্তু নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে কিছু নির্দেশনা দেন। এতে নির্বাচনকালে প্রধানমন্ত্রীসহ যে কোনো মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত নাকচ করার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনকে দেয়ার পক্ষেও আদালত মত দেন। ক্ষুব্ধ সাংসদরা একে আদালতের 'ধান ভাঙতে শিবের গীত' আখ্যা দিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেন। এরপর ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ও ১৬৭ ধারা সংশোধনের ব্যাপারে ১৩ বছর আগে হাইকোর্টের দেয়া রায়ের উপর তৎকালীন বিএনপি সরকার সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগে যে আবেদন করে, সেই আপীলের রায়ে আদালত হাইকোর্টের দেয়া রায় বহাল রাখেন। এ নিয়েও সংসদে ঝড় বয়ে যায়। বিনা ভোটে জয়লাভ করে প্রবল ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠা সংসদ সদস্যরা হাক ছাড়েন যে, বিচার বিভাগ আইন সংশোধনের ব্যাপারে কোনো নির্দেশ দিতে পারেন না, মত প্রকাশ করতে পারেন মাত্র। আইন সংশোধন হবে কি না হবে তা ঠিক করবে সংসদ। এ সময়ে বিচারপতিদের অভিশংসন সংসদের অধীনে আনার ব্যাপারে সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনীর প্রেক্ষিতে সাংসদরা যখন আইন প্রণয়ন করতে বসবেন, তখন আদালত খোদ ষোড়শ সংশোধনীকেই অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা করেন। আবার সংসদ সদস্যরাও বিচারকদের বেতন ভাতা বাড়ানোর একটি বিল নাকচ করে দেন, কিন্তু একই অধিবেশনে মন্ত্রী ও সাংসদদের বেতন ভাতা বাড়ানোর বিল পাশ করান। এতে রাষ্ট্রের দুই প্রধান স্তম্ভের নিয়ন্ত্রণকারীদের মধ্যেকার প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব আরও তীব্র রূপ নেয়।

বিচার বিভাগের এরকম একের পর এক কিছু পদক্ষেপ সরকারের বিরোধিতা সত্ত্বেও নেয়ার প্রেক্ষিতে আমরা কি এই ধারণা করতে পারি যে, বিচার বিভাগ স্বাধীন অবস্থান ব্যক্ত করছে কিংবা সরকারের প্রভাবমুক্ত হয়ে সে কাজ করার চেষ্টা করছে? এ সরকারের অবস্থানের দিকে তাকালেই আমরা দেখতে পাব যে, রাষ্ট্রের শক্তিকেন্দ্রসমূহকে একক নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার মধ্য দিয়েই সে দেশ শাসন করছে, সবদিক থেকে চূড়ান্ত ফ্যাসিবাদ কায়েম করেছে এবং বিরোধীদের কঠোরভাবে দমন করছে। এই দমন পীড়নের মধ্য দিয়ে সরকার যে সীমাহীন নৈরাজ্য চালাচ্ছে, বেহিসেবী হয়ে উঠছে, তাতে মানুষের মধ্যে যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হচ্ছে, এভাবে চলতে থাকলে রাষ্ট্রে যে আন্দোলন ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে– এটা বুর্জোয়া রাষ্ট্রের জন্য বিপজ্জনক। একটা কথা এখানে মনে রাখতে হবে যে, সরকার ও রাষ্ট্র এক বিষয় নয়। সরকার হলো পুঁজিপতিদের হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করার শক্তি। একভাবে বলা যায়, এটা একটা ম্যানেজারি করার কাজ। সরকার এক অর্থে পুঁজিপতিশ্রেণীর পলিটিক্যাল ম্যানেজার। কিন্তু রাষ্ট্র হলো শ্রেণীর সামগ্রিক স্বার্থরক্ষাকারী সামাজিক ব্যবস্থা। সরকার পাল্টায়, কিন্তু রাষ্ট্র পাল্টায় না। আর এই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য তার যে শক্তিকেন্দ্রগুলো আছে এর একটি হলো বিচার বিভাগ। কীভাবে, কোন্ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় তার এই আবির্ভাব হলো তা আমরা প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে আলোচনা করবো। কিন্তু একথা বুঝতে হবে যে, এই সময়ে বিচার বিভাগ যা করছে তা এই শ্রেণী রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখার জন্যই। সরকারের স্বেচ্ছাচারী আচরণকে খানিকটা নিয়ন্ত্রিত করা, খানিকটা বিচার আছে, গণতন্ত্র আছে এসব দেখানো, রাষ্ট্রকে একেবারে ব্যর্থ হিসেবে উপস্থিত হতে না দেয়া, মানুষকে রাষ্ট্রের প্রতি খানিকটা আশ্বস্ত করা– ইত্যাদি বিষয়গুলো এর মধ্যে আছে। এগুলো কোনো পরিকল্পনা করে বিচার বিভাগ করছে আমরা তা বলছিনা। এখানে কিছু কিছু বিচারকের দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ভূমিকা আছে তাও সত্য, একথা আমরা শুরুতেই বলেছি। কিন্তু যেসকল ব্যাপার ঘটছে, তার সবকিছুই ঘটছে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যেই, রাষ্ট্র ও শ্রেণীকে রক্ষা করার জন্য তার যে নির্ধারিত পথ সে পথেই। এটা দিয়ে বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে দাঁড়িয়েছে কিংবা জনগণের স্বার্থরক্ষার জন্য সে তৎপর হয়ে উঠেছে– সে সিদ্ধান্ত করা যাবে না। তাই ন্যায় বিচারের দাবিতে কিছু সংখ্যক বিচারকের সাহসী ভূমিকা যেহেতু পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যেই ঘটে তাই তা শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পক্ষে জনগণকে বিভ্রান্ত করে।

বুর্জোয়ারাই একসময় 'আইনের চোখে সবাই সমান' এই চিন্তা নিয়ে এসেছিল

আধুনিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রের জন্মের মধ্য দিয়েই বিচার ব্যবস্থা, পার্লামেন্ট ও আধুনিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা স্থাপিত হয়। ইতিহাসে এক সময় সামন্ততন্ত্রকে হটিয়ে যখন বুর্জোয়ারা ক্ষমতায় আসে তখন তারা এই আধুনিক রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করে, গড়ে তোলে পার্লামেন্ট ও বিচার ব্যবস্থা। ক্ষুদ্র আঞ্চলিক বাজার ভেঙ্গে দিয়ে এই বুর্জোয়ারা জাতীয় বাজার গড়ে তোলে। জাতীয় বাজারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে জাতীয় রাষ্ট্র। সেই জাতীয় রাষ্ট্র কীভাবে পরিচালিত হবে এ প্রশ্নকে সামনে রেখে, বুর্জোয়ারা তখন যে সমস্যাসমূহের মুখোমুখি হয়েছিল সেগুলোকে ভিত্তি করে, তার সমাধানের জন্য তারা রাষ্ট্রের এই কাঠামোটা দাঁড় করায়। সে সময় বুর্জোয়াদের ছোট ছোট পুঁজি ও সেই পুঁজির মালিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং তাকে কেন্দ্র করে সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও শক্তিসমূহের মতামত প্রদানের স্থান হিসেবে পার্লামেন্টের উৎপত্তি।

সে সময়ে বুর্জোয়া শ্রেণী এটাও বুঝেছিল যে, বুর্জোয়া সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইনসভা ও প্রশাসন যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে থাকে, সেখানে নিরপেক্ষ বিচার কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মর্জির উপর নির্ভর করে। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের প্রধান তিনটি স্তম্ভের মধ্যে আর বাকি থাকে বিচার বিভাগ। বুর্জোয়া রাষ্ট্রবিদেরা তখন ভেবেছিলেন যে, এই বিচার বিভাগের আপেক্ষিক নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা বজায় রাখাই ন্যায় বিচার ও আইনি ব্যবস্থার শেষ অবলম্বন। তাই তখন তারা ক্ষমতা বিভাজন তত্ত্ব নিয়ে আসেন। অর্থাৎ আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও প্রশাসন যার যার জায়গায় অপর বিভাগের হস্তক্ষেপমুক্ত আপেক্ষিক স্বাধীনতা অর্জন করবে। তাহলে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা কোনো দলের হাতে কেন্দ্রীভূত হবে না, ক্ষমতার একটা ভারসাম্য থাকবে। ফরাসী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মঁতেস্কু ছিলেন এই ক্ষমতা বিভাজন তত্ত্বের (Droctrine of separation of power)প্রবক্তা। যদিও কোনো বুর্জোয়া রাষ্ট্রেই এই ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন ঘটেনি, তবু এটা ঠিক যে পুঁজিবাদের অবাধ প্রতিযোগিতার সময়ে যেখানেই বুর্জোয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানেই এই মূলনীতিকে কার্যকরী রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

আমরা বলেছিলাম যে, বুর্জোয়া ব্যবস্থার উষালগ্নের সেই চিন্তার রেশ বর্তমানেও ব্যক্তি মানুষের মধ্যে কিছু কিছু দেখা যায়, এবং যখন তা দেখা যায় তখন ব্যবস্থার সাথে তার দ্বন্দ্ব প্রকাশ পায়। এ প্রসঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীন অবিভক্ত ভারতবর্ষের একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়। কী নির্মম অত্যাচারই না ব্রিটিশরা অবিভক্ত ভারতবর্ষের মানুষকে করেছে। সেখানে আইন-কানুনের কোনো বালাই ছিল না। এই সময়ই আবার কলকাতা হাইকোর্টের চীফ জাস্টিসকে বাংলার গভর্নর কোনো একটি অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করেন। চীফ জাস্টিজ সেই গভর্নরের বিরুদ্ধে সেসময় 'কনটেম্‌ট অব কোর্ট' অর্থাৎ আদালত অবমাননার মামলা করেন। কারণ গভর্নর সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি। সুতরাং তিনি একটি পক্ষ। আর বিচার বিভাগ অন্তত আপেক্ষিক অর্থে নিরপেক্ষ। তাই চীফ জাস্টিজকে কেউ ব্যক্তিগতভাবে নিমন্ত্রণ করতে পারে না। এটাও একইভাবে জনগণের মধ্যে আইনের শাসনের বিভ্রম তৈরি করে।

তবে আমাদের দেশে এতটুকু মাত্রায় এর বিস্তার ঘটেনি। গত ২৮ জানুয়ারি সন্ধ্যেবেলায় বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, প্রধান বিচারপতি, আইনমন্ত্রী ও এটর্নি জেনারেল মিলিত হন। আইনমন্ত্রী বলেছেন, এটি কোনো বৈঠক নয়, নৈশভোজমাত্র। প্রধান বিচারপতির এই ভোজসভায় অংশ নেয়া বিচারবিভাগকে কোথায় দাঁড় করায়? নৈশভোজে কী আলোচনা হয় দেশের জনগণ কি বোঝেন না? কিন্তু পুঁজিবাদ নামতে নামতে মানুষের চেতনার স্তরকেও এমন জায়গায় নিয়ে গেছে যে, দেশের শিক্ষিত লোকেরাও এ বিষয়টাকে অন্যায় মনে করেন না। এমনকি আইনের লোকেরাও না। কারণ হাতে গোনা কয়েকজন আইনবিদের প্রতিবাদ ছাড়া এ বিষয়ে কারও কোনো বক্তব্যও পরিলক্ষিত হয়নি।

আবার এটা তো ঠিক যে, বুর্জোয়ারাই একসময় রাজার নিরঙ্কুশ ক্ষমতার উপর গড়ে ওঠা সামন্ততান্ত্রিক যুগের ব্যক্তি শাসনের (Rule of person) উচ্ছেদ ঘটিয়ে তার পরিবর্তে সমাজে আইনি শাসন (Rule of law) প্রতিষ্ঠা করেছিল। ব্যক্তির পরিবর্তে আইনের শাসন হলো রাজতন্ত্রের স্বেচ্ছাচার থেকে মুক্ত হওয়ার ফল, তাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বুর্জোয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বলেছেন-

আইনের শাসনের অর্থ হলো- (১) সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে অনুমোদিত আইন ব্যতিরেকে কোনো সরকার শাসন চালাতে পারবে না। (২) নাগরিকের যেসব কাজকর্ম তৎকালীন আইন অনুযায়ী দন্ডনীয় ছিলনা, তাকে দন্ডনীয় করে এমন কোনো আইন হতে পারে না। (৩) কোনো ব্যক্তিকে প্রকাশ্য বিচারের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে আটকে রাখা যাবে না (৪) বিচারকরা বিচারকালে বাইরের চাপ ও নিয়ন্ত্রণ দ্বারা পরিচালিত না হয়ে স্বাধীনভাবে সাধারণ আইনকে বিশেষক্ষেত্রে প্রয়োগ করবেন। এই হলো আইনের শাসনের চার স্তম্ভ।

বুর্জোয়া ব্যবস্থার সূচনালগ্নের সেই ঘোষণাগুলোর দিকে তাকালে অবাক হতে হয় এই ভেবে যে, আজ ৫৪ ধারা ও ১৬৭ ধারা নিয়ে বিচার বিভাগ ও সরকারের মধ্যে আইনি লড়াই ও ব্যাখ্যা শুরু হয়েছে অথচ সূচনাপর্বের প্রাথমিক নীতিগুলোকে অনুসরণ করলেও এই ধারাসমূহ বহাল থাকার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু বিচার বিভাগ আইনের শাসনের মূলনীতির বিরোধী এই ধারাগুলো বহাল রেখেই সামান্য সংশোধনীর পরামর্শ দিয়েছিলো মাত্র, আর তাতেই সরকারের সবগুলো বিভাগ একত্রে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন।

সেদিন বুর্জোয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা একথাও বলেছিলেন যে, আইনের শাসন যেখানে প্রতিষ্ঠিত নেই, সেই শাসনব্যবস্থাকে সভ্য, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলা যায় না, কেননা সেখানে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও মর্যাদা বলতে কিছু থাকে না। ব্যক্তির নিরাপত্তা সেখানে শাসকবর্গের মর্জির উপর নির্ভর করে।

বুর্জোয়া উন্মেষের যুগে ব্যক্তিস্বাধীনতাই ছিল আইনের শাসনের ভিত্তি

আইনের শাসনের ভিত্তি তখন ছিল ব্যক্তির স্বাধীনতা, ব্যক্তির মর্যাদা। বুর্জোয়ারা দাবি করেছিল, "The rule of law is based upon the liberty of individual and has as it's the harmonizing of the opposing notions of individual liberty and public order. The notion of justice maintains a balance between those notions. Justice has a variable content and cannot be strictly defined, but at a given time and place, there is an appropriate standard by which the balance between private interest and common good can be maintained." (Colloquim on the rule of law) অর্থাৎ "আইনি শাসন ব্যক্তিস্বাধীনতাকে ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। এর লক্ষ্য হলো- ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সামাজিক নিয়মশৃঙ্খলা, এই দুই বিপরীত চিন্তার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা; আর ন্যায়বিচারের ধারণা এই দুইয়ের মধ্যে পারস্পরিক ভারসাম্য বজায় রাখে। বিচারবোধ বা তার চিন্তাচেতনার মধ্যে একটি পরিবর্তনশীল প্রাণসত্ত্বা থাকে এবং এর কোনো সীমিত সংজ্ঞা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। স্থান ও কাল অনুযায়ী তার একটি যথাযথ মাপকাঠি থাকে, যার সাহায্যে ব্যক্তিস্বার্থ ও সকলের কল্যাণ– এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হয়।" *(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

করবৃদ্ধি-লুটপাটের বাজেট প্রত্যাখ্যান ও রোজার মাসে

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বাম মোর্চার বিক্ষোভ

সদ্যঘোষিত জাতীয় বাজেট প্রত্যাখ্যান করে এবং রমজান মাসকে অজুহাত করে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ করার দাবিতে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার উদ্যোগে ৫ জুন রবিবার বিকাল ৫ টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়ক ও বাসদ(মার্কসবাদী)-র কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য মানস নন্দীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মোর্চার কেন্দ্রীয় নেতা বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকী, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য আবদুস সাত্তার, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা শহিদুল ইসলাম সবুজ, বাসদ(মাহবুব)-র ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক ইয়াসিন মিয়া, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আহ্বায়ক হামিদুল হক প্রমুখ। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল পল্টন এলাকা প্রদক্ষিণ করে।

২০ মে চা শ্রমিক দিবসে চা শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

২০ মে মহান চা শ্রমিক দিবস। আজ থেকে ৯৫ বছর আগে ১৯২১ সালে তৎকালীন বৃটিশ মালিক শ্রেণীর সীমাহীন শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রায় ৩০ হাজার চা শ্রমিক পন্ডিত দেওশরণ ও গঙ্গাদয়াল দীক্ষিতের নেতৃত্বে নিজ বাসভূমে ফিরে যেতে ঐতিহাসিক 'মুলুক চল' আন্দোলন করেছিল। রেল লাইনে রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে চাঁদপুর মেঘনা ঘাটে পৌঁছে স্টিমারে উঠতে চাইলে বৃটিশ সরকার ও মালিক পক্ষের লেলিয়ে দেওয়া গোর্খা বাহিনী নির্বিচারে গুলি চালালে শত শত চা শ্রমিক নিহত হয়। এই দিনটি হয়ে ওঠে চা শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের দিন। 'মুলুক চল' আন্দোলনের সেই সংগ্রামী চেতনাকে ধারণ করে চা শ্রমিকদের ভূমি অধিকার নিশ্চিত, ২০ মে কে রাষ্ট্রীয়ভাবে চা শ্রমিক দিবস ঘোষণা করাসহ ১০ দফা দাবিতে বাংলাদেশ চা শ্রমিক ফেডারেশনের উদ্যোগে চা শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

২০ মে দুপুর ৩টায় সিলেট জেলা পরিষদ মিলনায়তনে চা শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক হৃদেশ মুদির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত চা শ্রমিক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি জহিরুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক তানজিমউদ্দিন খান, বাসদ(মার্কসবাদী) সিলেট জেলা শাখার আহ্বায়ক উজ্জ্বল রায়, শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন জেলা আহ্বায়ক সুশান্ত সিন্‌হা, সাধারণ সম্পাদক মোখলেছুর রহমান প্রমুখ।

চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ১ম শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত

চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্যোগে দুইদিন ব্যাপী শিক্ষাশিবির ও কর্মশালা গত ১০-১১ জুন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষাশিবির ও কর্মশালা পরিচালনা করেন চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ইনচার্জ ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য সোমা। এতে আলোচনা করেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল(মার্কসবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী। তিনি বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরে আজকের দিনে শিল্পী-সাহিত্যিকদের করণীয় প্রসঙ্গে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, "আমাদের সমাজ সকল দিক থেকে শ্রেণী বিভক্ত সমাজ। শোষক শ্রেণী আর শোষিত শ্রেণীতে। শোষক শ্রেণী মানুষকে তার আধিপত্যে রাখবার জন্য তার স্বার্থভিত্তিক ভাবাদর্শ তৈরি করেছে।...আমরা এসেছি মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে, আমরা সর্বহারা শ্রেণীর পার্টি গড়ে তোলার চেষ্টা করছি, জীবনকে প্রভাবিত করার জন্য গণসংগঠন গড়ে তুলে কাজ করার চেষ্টা করছি।...রাজনৈতিক সংগ্রামে থেকেই এই সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সর্বহারা শ্রেণীর আদর্শ ধারণ ছাড়া সর্বহারা সংস্কৃতি তৈরি হবে না।...আমরা যে আদর্শ নিয়ে লড়ছি তা সমাজে প্রতিষ্ঠিত নয়। শত্রুর বিরুদ্ধে মানুষকে জাগিয়ে তোলা, জরাজীর্ণ সমাজকে ভাঙার গান, নাটক তৈরি করতে হবে। মানুষের মননশীলতার বিচিত্র রূপ আমাদের জানতে হবে...যৌথস্বার্থের জয়গান প্রকাশ হবে গান, কবিতা, নাটকের মধ্য দিয়ে। প্রত্যেক আন্দোলনকেই উৎসাহমথিত করতে সাংস্কৃতিক সংগঠনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাই সমাজ প্রগতির আন্দোলনকে সুতীব্র করার লক্ষ্যে উন্নত নৈতিক শক্তি ধারণ করে সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।"

সংগীতের উৎপত্তি ও ইতিহাস, ধ্বনি ও উচ্চারণ, তাল ও ছন্দ প্রভৃতি বিষয়ের উপর কর্মশালা পরিচালনা করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় ইনচার্জ ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য সোমা। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের 'সাংস্কৃতিক কর্মীদের প্রতি' পুস্তিকার উপর পরিচালিত এই শিক্ষা শিবিরের বিভিন্ন পর্বে উপস্থিত ছিলেন বাসদ(মার্কসবাদী)- কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড মঞ্জুরা হক নীলা, কমরেড মানস নন্দী, কমরেড উজ্জ্বল রায়, কমরেড ফখরুদ্দিন কবির আতিক। চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কর্মীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিক্ষাশিবির সমাপ্ত হয়।

কমরেড বোধিসত্ত্ব চাকমা স্মরণে শোকসভা অনুষ্ঠিত

সদপ্রয়াত বাসদ (মার্কসবাদী) রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সমন্বয়ক বোধিসত্ত্ব চাকমার স্মরণে শোকসভা গত ২৭ মে বিকাল ৬টায় তোপখানা রোডস্থ শিশু কল্যাণ পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। শোকসভায় সভাপতিত্ব করেন ও মূল বক্তব্য রাখেন পার্টি সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী। আরো বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড্স মানস নন্দী, উজ্জ্বল রায়, মঞ্জুরা হক নীলা।

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে বলেন, "বোধিসত্ত্ব চাকমা ছিলেন সংহত ব্যক্তিত্বের অধিকারী। মানুষ যখন আদর্শের প্রতি নিজেকে নিবেদিত করে অনুশীলনে ব্রতী হয়, তখন ব্যক্তিত্বের মধ্যে তার ছাপ ফুটে ওঠে। নিপীড়িত মানুষের প্রতি ভালোবাসা, তাদের দুঃখ-কষ্টের কার্যকারণ উপলব্ধি একদিন বোধিসত্ত্বকে মার্কসবাদী বিপ্লবী রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। পার্বত্য এলাকায় শাসকশ্রেণীর দীর্ঘদিনের অত্যাচার-নিপীড়ন, তার পাল্টা হিসেবে পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর সশস্ত্র লড়াই চলাকালীন জটিল পরিস্থিতিতে পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর একজন হয়ে মার্কসবাদী বিপ্লবী রাজনীতিতে যুক্ত হওয়া সহজ বিষয় ছিল না। তিনি ১৯৯২ সালে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট রাঙ্গামাটি কলেজ কমিটির আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চুক্তি হওয়ার পর পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর মধ্যে নানা বিভাজন, শাসকশ্রেণীর মদদে পাহাড়ী-বাঙ্গালী সাম্প্রদায়িক উস্কানি চলতে থাকে। এরকম পরিস্থিতিতে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও জনসংহতি সমিতির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করলেও পার্টির সাথে আদর্শগত সম্পর্কে ছেদ ঘটেনি। পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি নিয়ে সবসময় পার্টির সাথে দৃষ্টিভঙ্গি-মূল্যায়ন বিনিময় করেছেন। পরবর্তীতে শাসকগোষ্ঠীর উস্কানিতে ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত আরো জটিল রূপ নিলে রাজনীতির সে পথটির আভ্যন্তরীণ নানা বিষয়ে তার প্রশ্ন তৈরি হয়। জাতি সমস্যা সমাধানের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি কি হবে – এসব প্রশ্ন ও অনুসন্ধানের পথ পরিক্রমায় আঞ্চলিক সংগঠনে নিষ্ক্রিয় হয়ে পুনরায় পার্টি রাজনীতিতে সক্রিয় হন ২০১১ সাল থেকে। ২০১৩ সালে দলের অভ্যন্তরে মতবাদিক সংগ্রাম চলাকালে পার্টির তৎকালীন নেতৃত্বের শোধনবাদী অবস্থান প্রত্যাখ্যান করে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে দলের আদর্শিক অবস্থানের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করেন। পরবর্তীতে পার্টি রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সমন্বয়কের দায়িত্ব নেন। এই দীর্ঘ ধারাবাহিকতায় আমাদের মত দলের দায়িত্ব নেয়া, ক্রমাগত নিজেকে প্রস্তুত করা যথার্থ রাজনৈতিক উপলব্ধির গভীরতা ছাড়া সম্ভব ছিল না।"

তিনি আরো বলেন, "বোধিসত্ত্ব স্পষ্টভাবে বুঝেছিলেন – বিদ্যমান ব্যক্তিমালিকানাধীন সমাজব্যবস্থা মানুষের মধ্যে নানা ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনোভাব ও সংস্কৃতির যে পরিমন্ডল গড়ে তোলে, তাকে মোকাবেলা করতে হলে সমষ্টি তথা পার্টিস্বার্থের সাথে নিজেকে একাত্ম করতে হয়। শুধু ঐকান্তিক ইচ্ছা ও সততা দিয়ে এটি সম্ভব নয়। এ কঠিন কাজটি সঠিক পথে অনুশীলনের মধ্য দিয়ে রপ্ত করতে হয়। বোধিসত্ত্ব এ সংগ্রামের একজন অনুধ্যানী ছাত্র ছিলেন। সৌম্য শান্ত অথচ দৃঢ় মনোভাবাপন্ন বোধিসত্ত্বর ব্যক্তিগত গুণের আলোচনার মাধ্যমে প্রত্যেক কমরেড নিজেকে এই সংগ্রামে নিবিড়ভাবে নিবেদিত করার মাধ্যমেই সত্যিকার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন সম্ভব হবে। তাঁর মৃত্যুতে যে বড় ক্ষতি হলো সকলের সম্মিলিত সংগ্রামে তা পূরণ করা হোক আমাদের ব্রত।"

কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল গাওয়ার মাধ্যমে স্মরণ সভা সমাপ্ত হয়।

রাঙামাটিতে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত

বাসদ (মার্কসবাদী) রাঙামাটি জেলা শাখার উদ্যোগে কমরেড বোধিসত্ত্ব চাকমা স্মরণে ১০ মে বেলা ১১টায় জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে বিশিষ্ট রাজনৈতিক, সামাজিক , সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা পার্টি সংগঠক কলিন চাকমা। বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী)কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড মানস নন্দী, কমরেড উজ্জ্বল রায়, খাগড়াছড়ি জেলা সমন্বয়ক কমরেড জাহেদ আহমেদ টুটুল, বিশিষ্ট শিক্ষক ও জাক এর নীতি নির্ধারণী কমিটির সদস্য শিশির চাকমা, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সভাপতি বিজয়কেতন চাকমা, সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সুনীল কান্তি দে। স্মরণ সভা পরিচালনা করেন জেলা সংগঠক আশাধন চাকমা।

স্মরণ সভার পূর্বে লাল সালাম জানিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়

গ্যাস-বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাবনা বাতিলের দাবিতে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ে স্মারকলিপি পেশ

"নতুন করে গ্যাস-বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর প্রস্তাবনা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, কারণ বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম কমে যাওয়ায় বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ অনেক কমেছে। অথচ, বিদ্যুতের দাম কমানোর বদলে উল্টো বাড়ানো হচ্ছে। আর, গ্যাস আমাদের নিজস্ব সম্পদ ও লাভজনক খাত, এর দাম দফায় দফায় বাড়ানোর কোনো যুক্তি নেই। সকলের মতামত উপেক্ষা করে দাম বাড়ানোর উদ্যোগ মহাজোট সরকারের চরম স্বৈরতান্ত্রিক ও গণবিরোধী চরিত্রের পরিচায়ক।" গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর প্রস্তাবনা বাতিলের দাবিতে বাসদ(মার্কসবাদী)-র উদ্যোগে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ে স্মারকলিপি পেশের পূর্বে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এসব কথা বলেন। পার্টি ঘোষিত ১১-২৫ মে 'দাবি পক্ষ'-এর অংশ হিসেবে ২২ মে সকাল সাড়ে ১১টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মানস নন্দী, জহিরুল ইসলাম, ওবায়দুল্লাহ্ মুসা, ফখ্রুদ্দিন কবির আতিক, সাইফুজ্জামান সাকন প্রমুখ। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল পল্টন এলাকা প্রদক্ষিণ করে সচিবালয়ের সামনে গেলে পুলিশী বাঁধার মুখে পড়ে। সেখান থেকে একটি প্রতিনিধি দল মন্ত্রণালয়ে গিয়ে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে তাঁর একান্ত সচিবের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে।

তনু হত্যা, বর্ষবরণে নারী লাঞ্ছনার বিচারসহ ৫ দফা দাবিতে নারীমুক্তি কেন্দ্রের দেশব্যাপী স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান

রংপুরে স্বাক্ষর সংগ্রহ

তনুহত্যার বিচার, বর্ষবরণে নারী লাঞ্ছনাসহ ৫ দফা দাবিতে বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র মে থেকে আগস্ট পর্যন্ত দেশব্যাপী গণস্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান শুরু করেছে। গত ৬ মে ঢাকার শাহবাগে কর্মসূচির উদ্বোধন ঘোষণা করেন বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের সভাপতি সীমা দত্ত। সংগঠনের ঢাকা নগর শাখার সাধারণ সম্পাদক তাসলিমা নাজনীন সুরভীর পরিচালনা অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন নারীমুক্তি কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মর্জিনা খাতুন, কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট সুলতানা আক্তার রুবি। চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সুস্মিতা রায় সুপ্তি।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে নোয়াখালীতে বিক্ষোভ

রমজানকে সামনে রেখে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে ও সম্প্রতি ঘোষিত বাজেট গণবিরোধী দাবী করে নোয়াখালীতে মানববন্ধন-সমাবেশ হয়েছে। গত ৯ জুন বেলা সাড়ে ১১টায় নোয়াখালী প্রেসক্লাবের সামনে বাসদ (মার্কসবাদী) নোয়াখালী জেলা শাখা এ কর্মসূচি পালন করে।। সমাবেশে দলের জেলা আহ্বায়ক দলিলুর রহমান দুলালের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন জেলা ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের আহ্বায়ক তারকেশ্বর দেবনাথ নান্টু, বিটুল তালুকদার, মোবারক করিম প্রমুখ। এ সময় বক্তারা রমজানকে পুঁজি করে যেসব অসাধু ব্যবসায়ী দ্রব্যমূল্যের দাম লাগামহীনভাবে বাড়িয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান। একই সাথে দেশের সর্বত্র নিত্যপণ্যের দাম মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

মহান মে দিবস পালিত

মহান মে দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল(মার্কসবাদী) ও বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের উদ্যোগে ১ মে সকাল ১০টায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে এক মিছিল বের হয়ে পল্টন, প্রেসক্লাব হয়ে আবার সংগঠন কার্যালয়ের নিচে এসে শেষ হয়। ফখ্রুদ্দিন কবির আতিকের সভাপতিত্বে মিছিল পরবর্তী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি জহিরুল ইসলাম, ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ও বাসদ(মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য উজ্জল রায়, গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন নেতা ডা. মুজিবুল হক আরজু, রেডিমেড দর্জি শ্রমিকনেতা ইদ্রিস আলী, পুস্তক বাঁধাই শ্রমিক ফেডারেশনের সদস্য সচিব মানিক হোসেন, প্রাইভেট গাড়ী চালক ইউনিয়নের আহ্বায়ক মামুন মিয়া, নির্মাণ শ্রমিক রাশেদুল ইসলাম প্রমুখ।

পুরান ঢাকার বাহাদুর শাহ্ (ভিক্টোরিয়া) পার্কে ৮ মে বিকাল সাড়ে ৪টায় শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। থানা সংগঠক রাজীব চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে ও ছাত্র ফ্রন্ট জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক কিশোর সরকারের পরিচালনায় সভায় আলোচনা করেন বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি জহিরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক উজ্জ্বল রায়, সাইফুজ্জামান সাকন, পুস্তক বাঁধাই শ্রমিক ফেডারেশনের আহ্বায়ক জামিল ভূইঁয়া, মানিক হোসেন, রেডিমেড দর্জি শ্রমিকনেতা ইদ্রিস আলী, আবির মাহমুদ প্রমুখ। আলোচনা সভার শুরুতে গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। এছাড়াও রংপুর, সিলেট, ফেনী খাগড়াছড়িসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় মহান মে দিবস পালিত হয়।

উন্নয়ন বাজেটের ৪০% কৃষিখাতে বরাদ্দের দাবিতে জেলায় জেলায় স্মারকলিপি পেশ

সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট দিনাজপুর জেলা শাখার উদ্যোগে স্মারকলিপি পেশের পূর্বে মানববন্ধন করে

উন্নয়ন বাজেটের ৪০% কৃষিখাতে বরাদ্দ ও সরকার ঘোষিত ৯২০ টাকা মণ দরে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ধান ক্রয়ের দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট ২ জুন সকাল ১১টায় দিনাজপুর প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী) দিনাজপুর জেলার সমন্বয়ক রেজাউল ইসলাম সবুজ, কৃষক ফ্রন্ট-এর জেলা সংগঠক অনুপ বিশ্বাস প্রমুখ। সমাবেশ শেষে এক প্রতিনিধি দল জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে অর্থমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন। উল্লেখ্য যে, কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ কর্মসূচি পালিত হয়। একই দিন রংপুর, গাইবান্ধাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অনুরূপ কর্মসূচি পালিত হয়।

শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন-এর ২য় কেন্দ্রীয় শিক্ষা শিবির ২৭ ও ২৮ মে দুইদিনব্যাপী তোপখানা রোডস্থ শিশু কল্যাণ পরিষদ মিলনায়তন ও সংগঠন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সারাদেশ থেকে শ্রমিক ফেডারেশনের নির্ধারিত সংগঠকরা এই শিক্ষাশিবিরে অংশগ্রহণ করেছেন। শিক্ষাশিবিরের আলোচ্য বিষয় ছিল – 'সর্বহারা রুচি-সংস্কৃতি শ্রমিকদের কাছে নিয়ে যেতে হবে' শীর্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষের পুস্তিকা, শ্রমনীতি ও ন্যূনতম জাতীয় মজুরি প্রসঙ্গে এবং সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা ও সমস্যাদি। দেশের বিভিন্ন জেলার সংগঠকরা এসব বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষাশিবিরে সভাপতিত্ব করেন শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি জহিরুল ইসলাম, সঞ্চালনা করেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক উজ্জ্বল রায়। শিক্ষাশিবিরের সমাপনী সেশনে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও শ্রমিক আন্দোলনের সংগঠকদের করণীয় প্রসঙ্গে আলোচনা করেন বাসদ(মার্কসবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কমিটি গঠিত

গত ২৭ মে ২০১৬ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্র ফ্রন্টের ষোড়শ কাউন্সিলের মধ্য দিয়ে সংগঠনের সপ্তদশ কমিটি গঠিত হয়। ২৮ মে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের কমন রুমে আলোচনা সভা ও কমিটি পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিটি পরিচিতি সভায় উপস্থিত ছিলেন বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য সাইফুজ্জামান সাকন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নাঈমা খালেদ মনিকা, সাধারণ সম্পাদক স্নেহাদ্রি চক্রবর্ত্তী রিন্টু। আলোচনা সভা শেষে মশিউর রহমানকে আহ্বায়ক ও মাহাথির মুহাম্মদকে সাধারণ সম্পাদক করে সদ্য গঠিত ৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটিকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়।

বুর্জোয়া গণতন্ত্র - অতীত ও বর্তমান

(৩য় পৃষ্ঠার পর) অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সেদিন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। আইনের উর্ধ্বে কেউই নন, আইনের চোখে সবাই সমান – এই কথাগুলো সেদিন এসেছে। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের কাজও আইনের চোখে বিধিসম্মত হতে হবে, না হলে সে কাজ করা যাবে না– এই কনভেনশনগুলো তখন এসেছিল।

রাষ্ট্রীয় প্রশাসন কিংবা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তি সবাইকেই আইনের কাছে জবাবদিহি করতে হবে

বুর্জোয়াদের দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত সমাজে বাহ্যিক বা নিয়ম মাফিক হলেও দেশের প্রচলিত আইন (Law of land) সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য এটা ধরা হয়। কোনো কোনো বুর্জোয়া রাষ্ট্রে প্রচলিত 'প্রশাসনিক আইন' (Administrative Law- DROIT ADMINITRATIF) কোনো দিক থেকে আইনি শাসনের এই ধারণার বিরোধী নয় বরং আইনজ্ঞদের অভিমত হলো, এটি আইনি শাসন সম্পর্কিত ধারণারই প্রসার মাত্র। আইনের শাসন যে কোনো ব্যক্তি, সরকার বা রাষ্ট্রের যে কোনো প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছামত কাজ করার ক্ষমতা, পদমর্যাদালব্ধ বিশেষ ক্ষমতা বা আইনের প্রভাবমুক্ত কোনো অবাধ সার্বভৌম ক্ষমতার অস্তিত্বকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে।

এ প্রসঙ্গে বৃটেনের সাবেক প্রশাসনিক প্রধান চার্চিল, যিনি ছিলেন একটি সাম্রাজ্যবাদী দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, তার একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য, "The principles of complete independence of the judiciary from the executive is the foundation of many things in our island life……the judge has not only to do justice between man and man, he also- and this is one of the most important functions…. he has to do justice between the citizens and the state. He has to ensure that the administration conforms with the law and adjudicate upon the legality of the exercise by the executive of its power." অর্থাৎ "প্রশাসনের প্রভাবমুক্ত বিচার বিভাগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আমাদের দ্বীপের বহু কিছুর ভিত্তি। বিচারককে শুধুমাত্র ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির বিরোধের বিচারই করতে হয় না, তাকে নাগরিক ও রাষ্ট্রের পারস্পরিক বিরোধেরও বিচার করতে হয় এবং এটা তার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। তাকে লক্ষ্য রাখতে হয় প্রশাসন যেন আইন মেনে চলে এবং প্রশাসনিক ক্ষমতার প্রয়োগ আইনসঙ্গত হয়েছে কি'না সেটা তাকে বিচার করে রায় দিতে হয়।"

বুর্জোয়া রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, পুঁজিবাদের উন্মেষকালে গৃহীত সংবিধানসমূহ, চুক্তিসমূহ প্রভৃতি থেকে এ বিষয়ে এরকম অসংখ্য উক্তি সংযোজন করা যাবে যেখানে নাগরিকদের অধিকার রক্ষা, রাষ্ট্রীয় আইন পালনের ক্ষেত্রে অধিকার কোথাও ক্ষুণ্ন হয় কি'না সেটা বারবার করে দেখা, বিচার বিভাগের সে সম্পর্কিত দায়িত্ব– ইত্যাদি উল্লেখ করা আছে। এমনকি সেদিন এইসকল প্রশ্নে রাষ্ট্রের সমালোচনা করা, মানুষকে সচেতন করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকায় বুর্জোয়ারা সেদিন সংবাদপত্রকে ক্ষমতার আধারের বিচারে একটি স্বতন্ত্র শক্তি (Fourth Estate) হিসেবে মেনে নিয়েছিল।

আজ আমাদের দেশের প্রশাসনের দিকে তাকালে কথাটি অনেকের কাছেই হাস্যকর বলে ঠেকবে। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৫ সালে দেশে ১৮৩টি বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। অর্থাৎ গড়ে প্রতি দুই দিনে একজন বিচার ছাড়াই আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে মৃত্যুবরণ করছে। একটি আধুনিক রাষ্ট্রে বিচার বহির্ভূতভাবে এত সংখ্যক হত্যার ব্যাপারে বিচার বিভাগ নির্বিকার। নারায়ণগঞ্জে ৭ খুনের ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী জড়িত থাকার কথা প্রমাণিত হয়েছে। ইতোমধ্যে পুলিশ-র‍্যাবসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ছিনতাই, মুক্তিপণ আদায়ের সাথে জড়িত বলে প্রমাণিত হয়েছে, কয়েকজন পুলিশ সদস্য পাবলিকের হাতে ধরা পড়েছেন, কেউ কেউ মারও খেয়েছেন। এই পরিস্থিতি স্বীকার করে পুলিশের আই.জি বলেছেন, এরকম পুলিশ কর্মকর্তাদের যাতে জনগণ প্রতিরোধ করে। অর্থাৎ কথাটি ঘুরেফিরে এই দাঁড়ায় যে, বিষয়টি তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। সাম্প্রতিক সময়ে একজন ব্যাংক কর্মকর্তা ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের একজন কর্মকর্তাকে বেধড়ক পিটিয়ে সংবাদপত্রের শিরোনাম হয়েছে পুলিশ। মিরপুরে চাঁদা নিয়ে বাকবিতন্ডার এক পর্যায়ে চায়ের দোকানদারকে ধাক্কা দিয়ে উনুনে ফেলে দিয়ে হত্যা করে পুলিশ। রাজধানীর শ্যামলী এলাকায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক তরুণীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ ওঠে পুলিশের এক এস.আই এর বিরুদ্ধে। সাম্প্রতিক সময়ে ক্যান্টনমেন্টের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার মধ্যে কুমিল্লায় ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রী তনুকে ধর্ষণ ও খুন করা হলো। এসকল ঘটনার কোনোটারই আজ পর্যন্ত বিচার হয়নি। অর্থাৎ প্রশাসনের কাজ আইনসঙ্গত হয়েছে কি'না তা দেখার জন্য যে আপেক্ষিক অর্থে স্বাধীন বিচার বিভাগের প্রয়োজনের কথা বুর্জোয়ারা বলেছিল এবং তাকে যে ক্ষমতা একসময় দিয়েছিল তার অস্তিত্ব এদেশে নেই। এসব কথা আজ ইতিহাস মাত্র।

যা কিছু আইনসঙ্গত তা ন্যায়সঙ্গত ও মানবিক নাও হতে পারে

আইনের এ বিষয়সমূহ আলোচনার সময় একটা জিনিস আমাদের মাথায় রাখা দরকার তা হলো, আমরা যে আইনের আলোচনা করছি, সেটিও একটি বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে সমাজে এসেছে, বিকশিত হয়েছে। তাকে গড়ে তোলা হয়েছে ঐ সমাজে তখন যারা নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তাদের প্রয়োজনেই। সামন্ত রাজা-বাদশাদের শাসনের মধ্যে সওদাগররা বিভিন্ন জায়গায় পণ্য বিক্রি করার মাধ্যমে যে বণিকী পুঁজি গড়ে তুলেছিল, তার আরও প্রসার ঘটার সম্ভাবনা, কুটির শিল্পের বৃহৎ শিল্প হয়ে ওঠার সম্ভাবনা– ইত্যাদি ক্ষেত্রে তখনকার সামন্ত শাসন ব্যবস্থা ছিল এক বিরাট বাধা। তাই তখন সমাজের সেই সময়ের অগ্রসর শ্রেণী, বণিক শ্রেণী নিজের স্বার্থেই সেই সমাজ ভাঙতে চেয়েছে। সামন্ত সমাজ ভেঙে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় তারাই ছিল সেদিন নেতৃত্বে। তাদের ছোট ছোট পুঁজির প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যাতে নিরপেক্ষ থাকে, ন্যায় বিচার যাতে নিশ্চিত হয়– সেজন্য তারা আইনের এই কথাগুলো এনেছে। অর্থাৎ সেদিনও আইন সমাজের একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীকে রক্ষার জন্যই এসেছিল। কালক্রমে পুঁজিবাদ একচেটিয়া পুঁজিতে রূপান্তরিত হওয়ায় বুর্জোয়াদের কাছে ন্যায়বিচারের যে প্রয়োজন সে সময় ছিল তা আজ আর নেই। রাষ্ট্রের সমস্ত শক্তিকে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের পদানত করা ও তাদের স্বার্থে কাজে লাগানোই হচ্ছে আজ রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য। তাই আজ সকল বুর্জোয়া রাষ্ট্রে শোষিত মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের সঙ্গে যখনই শাসক শ্রেণীর স্বার্থের দ্বন্দ্বটি উপস্থিত হচ্ছে, তখন সাধারণ মানুষের দাবির ন্যায্যতাকে অস্বীকার করেই তার তথাকথিত মীমাংসা হচ্ছে। অর্থাৎ রাষ্ট্র যখন একটি শ্রেণীর রাষ্ট্র, সমাজে অবস্থিত কোনো না কোনো শ্রেণী যেহেতু তাকে পরিচালিত করে সেহেতু তার সমস্ত প্রতিষ্ঠান তা প্রশাসনই হোক আর বিচার বিভাগই হোক- নিরপেক্ষ থাকতে পারে না। সেই শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্যই সে কাজ করে।

একই সঙ্গে আরেকটি প্রশ্ন আমাদের সামনে আসে। বুর্জোয়া রাষ্ট্রে বিচারব্যবস্থা যদি সত্যই আপেক্ষিক নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা অর্জন করে তাহলেই কি মানুষের একান্ত মানবিক, যৌক্তিক ও ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলোর সমর্থন মিলবে? বুর্জোয়া মানবতাবাদীদের মধ্যে সৎ, নৈতিক অনেক লোক যারা এখনও ন্যায়বিচারের জন্য লড়েন তাদের এ প্রশ্নটি ভেবে দেখা দরকার বলে আমরা মনে করি।

সমাজবিকাশের ইতিহাস সম্পর্কে যারা জানেন, তারা স্বীকার করবেন– নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধের মতনই আইন সম্পর্কে প্রচলিত মূল্যবোধটিও সমাজ অগ্রগতির সঙ্গে সম্পর্কিত সামাজিক ন্যায়বিচার ও ন্যায্যতার ধারণাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। একটি নতুন সমাজ গঠনের সময় সে সময়ের সমাজপ্রগতির স্বার্থে যে নীতি-নৈতিকতা-মূল্যবোধের সৃষ্টি হয় ও তার ভিত্তিতে যে আইন প্রণীত হয়, সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে তাও পুরাতন রক্ষণশীল সুবিধাভোগী শাসকশ্রেণীর কায়েমী স্বার্থে পর্যবসিত হয়। বুর্জোয়া সমাজ চলতে চলতে একসময় যখন শাসকশ্রেণীর চরিত্র হয়ে পড়লো সমাজপ্রগতির পরিপন্থী, তখন তারই স্বার্থের রক্ষক রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য যে আইন তাও হয়ে পড়লো প্রতিক্রিয়াশীল। যে কোনো সমাজে এই পরিস্থিতিতে, এই সময়ে সমাজপ্রগতির প্রয়োজনে সমাজ অভ্যন্তরে নতুন চিন্তা, ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধ গড়ে ওঠে- যার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে আইন ও ন্যায্যতা সম্পর্কে নতুন প্রশ্ন, নতুন ধারণা ও নতুন মূল্যবোধ জন্ম নেয়। পুরাতন ন্যায়নীতি-মূল্যবোধের সাথে তখন তার দ্বন্দ্ব সংঘাত হয়। একসময় পুরাতনের প্রয়োজন নিঃশেষ হয়ে যায়, তা পরিত্যক্ত হয়। তার জায়গা পূরণ করে উন্নত চিন্তা ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা নতুন আইন ও বিচার ব্যবস্থা। এভাবেই একদিন সামন্ত সমাজের নীতি-আদর্শ-মূল্যবোধ ও তার আইনকে নিঃশেষ করে দিয়ে বুর্জোয়া বিচার ব্যবস্থা গড়ে ওঠেছিল। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে একদিন তাকেও বিদায় নিতে হবে।

তাই প্রচলিত আইনের সাথে নতুন চিন্তার সংঘাত হচ্ছে, আইনসঙ্গত হচ্ছে না; মানে এই নয় যে তা অন্যায়, অন্যায্য। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার করণীয় নির্দেশ করতে গিয়ে এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, "এথিক্স ও জুরিস্প্রুডেন্স এর ছাত্রদের জানারই কথা যে, শ্রেণীশোষিত সমাজে যা কিছু আইনসঙ্গত তা ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিযুক্ত ও নৈতিক নাও হতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই, যা কিছু প্রচলিত আইনসম্মত নয়, তাও অনৈতিক, অন্যায় ও অযৌক্তিক নাও হতে পারে।"

কোন্ আইনের শাসন– একথা বিচার করা গুরুত্বপূর্ণ

আইনের শাসনের কথা বলতে হলে আইনের চরিত্র উন্মোচিত করাও গুরুত্বপূর্ণ। ২০০২ সালের অক্টোবর থেকে ২০০৩ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত তৎকালীন বিএনপি সরকারের যৌথ বাহিনীর হাতে ৫৮ জন মানুষের মৃত্যু হয়। সংবাদপত্রের ভাষায় যাকে বলে 'নন জুডিশিয়াল কিলিং'। এ হত্যার জন্য যৌথ বাহিনীকে আইন করে দায়মুক্তি দেয়া হলো। অর্থাৎ আইনগতভাবেই কোনো বিচার ছাড়াই তাদের হত্যাকে বৈধ বলে ঘোষণা করা হলো। ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে নির্বাচিত প্রথম সংসদের মেয়াদ ছিলো ৫ বছর। ১৯৭৫ সালের জানুয়ারিতে সংবিধানে ৪র্থ সংশোধনী এনে বলা হলো ঐ প্রথম সংসদের মেয়াদ হবে ৫ বছর। তবে গণনা শুরু হবে ৪র্থ সংশোধনীর দিন থেকে অর্থাৎ ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ থেকে। আজ যদি আইন করে এ সরকারের মেয়াদ ২০২১ কিংবা ২০৪০ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া হয়– তাহলেও সরকারের ক্ষমতায় থাকাটা আইনসঙ্গত হবে। কিন্তু তা ন্যায়সঙ্গত হয় কি? ৫ জানুয়ারির নির্বাচন আইন রক্ষার জন্য, সংবিধান রক্ষার জন্য, আইনসঙ্গত পথেই হয়েছে বলে সরকারের দাবি। আদালত এ ব্যাপারে রায়ও দিয়েছেন। কিন্তু রায়ের পরেও আদালতকে নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে নির্দেশনা দিতে হলো কেন? কারণ এটা এতোটাই অন্যায়, অসঙ্গত হয়েছে যে, আদালত আইনের সাধারণ, স্বাভাবিক যুক্তিতে একে বৈধ ঘোষণা করলেও গোটা দেশের জনগণের কাছে এ নির্বাচন অবৈধ, অগণতান্ত্রিক হিসেবেই প্রতীয়মান।

আইনসভার বর্তমান সদস্যবৃন্দের নির্বাচন প্রক্রিয়াই প্রশ্নবিদ্ধ

বর্তমান আইনসভার সদস্য অর্থাৎ সাংসদদের মধ্যে ১৫৩ জনই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত। বাকিরা যারা নির্বাচিত হয়েছেন তারা কী প্রক্রিয়ায় হয়েছেন তা সকলের জানা। এরকম একটি সংসদে কি ধরনের আইন প্রনয়ণ হতে পারে? যে আইনসভাকে জনগণ সমর্থন করেনি, সেখানে যে আইন তৈরি হবে সেটি হবে জনগণের অনাস্থাকে জোরপূর্বক দমনের জন্যই, এছাড়া আইনসভা নিজেকেই টিকিয়ে রাখতে পারে না। বর্তমান সময়ে সরকার খুব দ্রুততার সাথে একের পর এক আইন তৈরি করে যাচ্ছে। এই আইনগুলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তার সবগুলোই বিরোধী মতকে জোরপূর্বক দমনের জন্য। উদাহরণস্বরূপ 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) আইন ২০১৩', 'মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতকরণ অপরাধ আইন'-র উল্লেখ করা যেতে পারে। এই আইনগুলো প্রনয়ণ ও তার ভবিষ্যৎ নিয়ে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারকরা, বুদ্ধিজীবীরাও শঙ্কিত। দেশের প্রথম সারির একটি পত্রিকায় তাদের আইন বিষয়ক লেখক লিখেছেন, "সমাজে যখন গণতান্ত্রিক রীতিনীতির ঘাটতি বেশি পড়ে, তখন নতুন আইনের আবির্ভাব কোনো স্বস্তির বিষয় হতে পারে না। ...আগে আইনের অপব্যবহার নিয়ে আমরা বড় উদ্বিগ্ন থাকতাম। এখন তার থেকে অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। কারণ কতিপয় ক্ষেত্রে খোদ আইনটাই হচ্ছে এমনভাবে যা ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে প্রয়োগ করার সুযোগ নেই।" সামন্ততন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে বুর্জোয়ারা যে সংবিধান ও আইনের শাসনের কথা বলে একদিন গৌরব করতো– আজ তাকেই তারা চরম স্বেচ্ছাচারিতা করার জন্য ব্যবহার করছে। তাই আজ বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের অল্প অংশ হলেও বলতে বাধ্য হচ্ছেন যে, আইনটাই এমন করে তৈরি হচ্ছে যে ন্যায়বিচার থাকার কোনো উপায়ই এর মধ্যে নেই।

উন্নত-অনুন্নত সকল পুঁজিবাদী দেশেই ফ্যাসিবাদ আজ সাধারণ বৈশিষ্ট্য

আজ সারা বিশ্বের কোথাও আর সেই আইনের শাসন নেই। অথচ বুর্জোয়ারাই এখনও ক্ষমতায় যারা এই আইনের শাসন দুনিয়ায় এনেছিল। সত্য হলো এই যে, বুর্জোয়ারা যখন এই আইনের শাসনের কথা বলেছিল, মত প্রকাশের অধিকারের কথা বলেছিল, একথা সেদিন সে বলেছিল তারই প্রয়োজনে। তখন ছিল পুঁজিবাদের শুরুর সময়। আমরা আগেই বলেছি, তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজির মালিকরা ছিল, তাদের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা ছিল। পুঁজিবাদের সূচনালগ্নে অবাধ প্রতিযোগিতার অর্থনীতির উপরিকাঠামো হিসেবে পার্লামেন্ট, বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদি এসেছিল। কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশের স্বাভাবিক নিয়মেই অবাধ প্রতিযোগিতার স্তরের একদিন অবসান হলো। বিকাশের এই স্তরে পুঁজিবাদ একচেটিয়া পুঁজি ও লগ্নি পুঁজির জন্ম দিল, যার অপর নাম সাম্রাজ্যবাদ। পুঁজিবাদ পরিবর্তিত হয়ে হল একচেটিয়া পুঁজিবাদ। এই একচেটিয়া পুঁজি রাষ্ট্রীয় পুঁজির সাথে মিলন ঘটিয়ে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজির সৃষ্টি হয়েছে। এই রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজি ফ্যাসিবাদের ভিত্তিমূল।

পুঁজিবাদের এই অবস্থা অবলোকন করে এ যুগের অগ্রণী মার্কসবাদী চিন্তানায়ক ও দার্শনিক, ভারতের এসইউসিআই(সি) এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, "কি উন্নত, কি অনুন্নত, সকল পুঁজিবাদী দেশেই, বিশেষতঃ প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ও রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে ফ্যাসিবাদ নানা রূপে, নানা প্রকারে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। *(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

বুর্জোয়া গণতন্ত্র - অতীত ও বর্তমান

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর) .....এমনকি যে সব বুর্জোয়া দেশে পার্লামেন্টের সুদীর্ঘ ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল, সেখানেও বুর্জোয়া সংসদীয় গণতান্ত্রিক অধিকার, সুযোগ সুবিধাগুলোও ক্রমাগত খর্ব করা হচ্ছে। বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছেও বুর্জোয়া পার্লামেন্টের প্রয়োজনীয়তা দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে।"

ইতালি, জার্মানি, অস্ট্রিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন বুর্জোয়া দেশের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখেছি যে, কোনো একটি ফ্যাসিস্ট দলের পক্ষে, রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন অংশ– পুলিশ, আমলা, মিলিটারির যোগসাজশে, নকল নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, ভয়-ভীতি-সন্ত্রাসের আবহাওয়া সৃষ্টি করে, নিরঙ্কুশ একচেটিয়া ক্ষমতার অধিকারী হয়ে, সংবিধানকে সামনে সাজিয়ে রেখে তারই আড়ালে ফ্যাসিবাদী একনায়কত্ব কায়েম করা খুব একটা দুরূহ ব্যাপার হয়নি। ঐসব দেশে এইভাবেই ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েম হয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় এই সব শাসন ব্যবস্থাকে 'সাংবিধানিক একনায়কত্ব" (Constitutional Dictatorship) বলে আখ্যায়িত করা হয়। ইতালিতে ক্রিসপির নেতৃত্বে এইভাবেই সংসদকে বজায় রেখেই ক্ষমতার স্বেচ্ছাতন্ত্র তৈরি হয়েছিল। ক্রিসপির সাংবিধানিক একনায়কত্বের ইতালিয়ান এই মডেলটি হলো, সংসদকে জিইয়ে রেখে বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত অংশের একজন সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট প্রধানমন্ত্রীর হাতেই বাস্তবে ক্ষমতার চূড়ান্ত কেন্দ্রিকরণ। এরা প্রগতিশীলতা, সাম্প্রদায়িক সমস্যার বিরুদ্ধে লড়াই করা, দেশের উন্নতি– ইত্যাদি কথা বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করেন এবং জনগণের মধ্যে উগ্র জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণা গড়ে তোলেন। যেমনটি এখন আমাদের দেশে হচ্ছে। রাষ্ট্রের সকল প্রতিষ্ঠানকে একচ্ছত্রভাবে দলীয় করায়ত্তে নিয়ে আসা হয়েছে আর তার পক্ষে জনগণকে ধরে রাখার জন্যে একদিকে যেমন নিপীড়ন, নির্যাতন, জেল, জুলুম চলছে; অপরদিকে চলছে উগ্র জাতীয়তাবাদের চর্চা, উন্নয়নের ডামাডোল আর অসাম্প্রদায়িকতার ভেক। আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী ও তথাকথিত বাম প্রগতিশীলরা ফ্যাসিবাদের ইতিহাস হয়তো আমাদের থেকেও ভাল জানেন, তবুও দেশে সাম্প্রদায়িকতার ভয়াবহ সমস্যা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আওয়ামী লীগের বিকল্প কিছু দেখেন না, সবরকম অধিকার কেড়ে নেয়ার পরও কিছু তো উন্নয়ন হচ্ছে এই যুক্তি তুলেন। ফ্যাসিবাদের পক্ষে জনগণকে বিভ্রান্ত করে রাখার জন্য তাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির এই অপূর্ব চর্চাকে আমরা সাধুবাদ না জানিয়ে পারছিনা !

জনগণের মনে রাখা দরকার যে আইন, সংসদ, সংবিধান ইত্যাদি প্রসঙ্গে বুর্জোয়ারা যে কথাগুলো এনেছিল সেগুলো সেদিন তাদের শ্রেণীস্বার্থেই এনেছে, আজ আবার তাদের শ্রেণীস্বার্থেই তাকে তারা নির্মমভাবে পদদলিত করছে।

বিশ্বপুঁজিবাদের ক্ষয়ের যুগে বাংলাদেশের জন্ম। ফলে সে পুঁজিবাদের উন্মেষকালের সেই চেতনাকে ধারণ করবে না এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু দীর্ঘদিন পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে স্বাধীনতা অর্জন এবং স্বাধীনতা পরবর্তীকালে স্বৈরাচারবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একটি ঐতিহ্য থাকায় এদেশের বুর্জোয়াদের কিছু অধিকার জনগণকে দেয়ার কথা বলতে হয়েছিল, সংবিধানেও কিছু কথা লিখতে হয়েছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে তার সবই লয়প্রাপ্ত হচ্ছে, বিশেষ করে মহাজোট সরকার দ্বিতীয়বারের মতো যখন সাজানো নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এলো এবং দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিরা যেভাবে তার সমর্থনে দাঁড়ালো তাতে গণতন্ত্রের ভানটুকু ছেড়ে দিয়ে সরাসরি ফ্যাসিবাদী কায়দায় দেশ পরিচালিত হওয়া শুরু করলো। সংবিধানসম্মতভাবেই নির্মম ফ্যাসিবাদী শাসন প্রতিষ্ঠা করলো আওয়ামী লীগ। এ অবস্থায় দেশে এখন বিচার বিভাগের উপর উপর সম্ভ্রমটুকুও আর থাকছে না। বিচারপতিদের নিজেদের মধ্যে বিতর্কই শুধু নয়, বর্তমান সময়ে বিনা বিচারে মৃত্যু রেকর্ড ছাড়িয়েছে, সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেল নিয়ন্ত্রণে নতুন আইন প্রবর্তিত হয়েছে, দুটি পত্রিকার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী, প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং বিষোদগার করছেন, হুমকি দিচ্ছেন, একটি পত্রিকার সম্পাদকের নামে দেশের বিভিন্ন কোর্টে অর্ধশতাধিক মামলা করা হয়েছে হয়রানির জন্য, এমনকি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বলা অনানুষ্ঠানিক মন্তব্যকেও বিচারের আওতায় আনা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে ফেসবুকে মন্তব্য লেখার জন্য গ্রেফতার করা হচ্ছে। সদ্য সংশোধিত ২০০৬ সালের আইসিটি অ্যাক্টের মাধ্যমে যাকে তাকে যখন তখন জেলে পুরে দিচ্ছে সরকার। এ বিষয়ে ইতিহাসের একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে আমেরিকার আইনে মানুষের মত প্রকাশের অধিকারকে এত গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল যে, বলা হতো, কেউ যদি ঘোষণা করে যে কাল আমি আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে হত্যা করব, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রশাসন গ্রেফতার করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আক্রমণে উদ্যত হয়। আমেরিকার আইনি ব্যবস্থায় একটা কথা আছে 'একই বিষয় দেখা যায় ইউরোপিয়ান কনভেনশনেও। হায় বুর্জোয়া গণতন্ত্র, বুর্জোয়া রাষ্ট্র, তার আইন! আজ সে কোথায় নেমেছে!

আজ মানুষ এই বিচার ব্যবস্থার উপর আস্থা হারিয়েছে। পার্লামেন্টের উপর আস্থা হারিয়েছে। বাস্তবে আজ এগুলো অকার্যকর হয়ে পড়েছে। এর কারণ পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করেই এগুলো এসেছিল, সেই ব্যবস্থাই আজ অকার্যকর। দেশের এক বিশিষ্ট আইনজীবী ড. শাহ্‌দীন মালিক বলেছেন, "শিশু আব্দুল্লাহ্ হত্যা মামলার প্রধান আসামী মোতাহার র‍্যাবের ক্রসফায়ারে নিহত হওয়ায় টিভিতে দেখলাম এলাকাবাসী উল্লাস করছে, মিষ্টি খাচ্ছে এবং বলছে ন্যায়বিচার হয়েছে। তাহলে আমাদের অবস্থা কোথায়? মানুষ মনে করছে এটাই বিচার। জনগণকে এটা মনে করাতে আমরা বাধ্য করেছি।"

তিনি বলেছেন, "এখন ফোর ইন ওয়ানের যুগ। অভিযোগ গঠন করে র‍্যাব, তদন্ত করে র‍্যাব, দোষী-নির্দোষ সিদ্ধান্ত নেয় র‍্যাব। শাস্তি কার্যকর করে র‍্যাব। ফোর ইন ওয়ান। যেসব ব্যাপার বা ঘটনায় র‍্যাবের কোনো ইন্টারেস্ট নেই, সেসব ঘটনায় আমরা আদালতে মামলা চালাই।...২০৪১ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না। তার আগেই আমরা উন্নত বিশ্বের কাতারে যোগ দেব। তবে আইনের শাসন বাদ দিয়ে। চলবে র‍্যাবের শাসন, পুলিশের শাসন, রিমান্ডের শাসন এবং আরও নতুন নতুন শাসন। জাদুঘরে ঢুকবে আইনের শাসন।"

মানুষের যাওয়ার শেষ জায়গা আদালত– সে আজ জাদুঘরে, পার্লামেন্ট তো অনেক আগেই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে পরিণত হয়েছে। সংসদে ৩০০ জন সাংসদের ১৫৩ জনই ভোটের পূর্বে জয়ী হয়েছেন। বাকিরা কীভাবে হয়েছেন তা সকলের জানা। কিন্তু তার বাইরের ঠাঁট-বাট ঠিকই আছে। সরকারি দল আছে, বিরোধী দল আছে, স্পিকার আছেন, তর্ক-বিতর্ক হচ্ছে, আইন পাশ হচ্ছে– সবই আছে, সবই চলছে, নেই শুধু 'জনতার ইচ্ছা', যার জন্য বুর্জোয়ারা একসময় প্রাণ শপথ করেছিল। এই হচ্ছে আজ আব্রাহাম লিংকনের 'of the people, by the people, for the people' গণতন্ত্রের হাল। এই হয়! রাষ্ট্রের এই ভয়াবহ ফ্যাসিবাদী চেহারা দেখিয়ে এখন বিএনপি-জামাতরা গণতন্ত্রের তাল ঠুকবেন, জনগণের জন্য আন্দোলন, লড়ালড়ির ভাব দেখাবেন। এ সবই গদিতে বসার জন্য। ক্ষমতায় গেলে এরা সবাই এক– সেই একই বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা, মানুষের স্বার্থ জলাঞ্জলী। পূর্বের তুলনায় আরও ভয়াবহ শোষণ, অন্যায়, নির্যাতন, ক্ষমতার যথেচ্ছা ব্যবহার। এদের সম্পর্কে শোষিত মানুষ সতর্ক না হলে ঠকবে। এবং এই ঠকবাজী বিরামহীন চলতেই থাকবে, যতদিন বুর্জোয়ারা তা চালিয়ে যেতে পারে। এর অবসান সেইদিনই হবে যেদিন সর্বহারা গরীব মানুষেরা এই ঠকবাজী ধরতে পারবে, নিজেদের শ্রেণী রাজনীতিটা বুঝতে পারবে, চিনে নিতে পারবে সর্বহারা শ্রেণীর প্রকৃত দলটিকে। তাই আজ ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র চাইলে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে হবে– এটা যতদিন না মানুষ বুঝতে পেরেছে এবং তা ভাঙ্গার লড়াইয়ে নেমে আসছে ততদিন তার মুক্তি নেই।

আর আজকের দিনে বাম গণতান্ত্রিক শক্তিকেই এই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। এই বিশ্বাসে আমরা জনগণের সবরকম আন্দোলন-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করব এবং তাদের সংগঠিত করে গণআন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করব। আমরা সকল বাম গণতান্ত্রিক শক্তিকে এ লড়াইয়ে এগিয়ে আসার আহবান জানাই।

শিক্ষা আইন বাতিলের দাবিতে শিক্ষামন্ত্রীকে স্মারকলিপি পেশ

(শেষ পৃষ্ঠার পর) স্নেহাদ্রি চক্রবর্তী রিন্টু, কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি সত্যজিৎ বিশ্বাস, সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ রানা ও অর্থ সম্পাদক শরীফুল চৌধুরী। সমাবেশ পরিচালনা করেন দপ্তর সম্পাদক রাশেদ শাহরিয়ার।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, আজ ২ জুন জাতীয় সংসদে বাজেট উত্থাপিত হবে। আমাদের সংগঠনসহ অন্যান্য বাম সংগঠনগুলো দীর্ঘদিন থেকেই জাতীয় বাজেটের ২৫ ভাগ শিক্ষাখাতে বরাদ্দের দাবি করে এসেছে। কিন্তু আজও সে দাবির প্রতিফলন আমরা দেখতে পাইনি। বরং স্বাধীনতার পর ক্রমাগত এই গুরুত্বপূর্ণ খাতে রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ কমেছে। ১৯৭২ সালে জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ছিল ২১ ভাগ। সর্বশেষ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে তা কমতে কমতে এসে দাঁড়িয়েছে ১০.৭ শতাংশে। বলা হচ্ছে যে, দেশের জিডিপি বাড়ছে কিন্তু জিডিপি বাড়ছে যাদের শ্রমে-ঘামে, তাদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়টি বাজেটে গুরুত্ব পাচ্ছে কি? শিক্ষাখাতে জিডিপির শতাংশের বরাদ্দের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ১১৮ তম। ফলে এই ৪৫ বছরে শিক্ষায় রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ কম হওয়ায়, প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে না উঠায় ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ক্রমাগত বেসরকারি স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, গত ২০১০ সালে আওয়ামী লীগ নের্তৃত্বাধীন মহাজোট সরকার 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' প্রণয়ন করে। সেই সময়ই আমরা বলেছিলাম এই শিক্ষানীতি শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ-বেসরকারিকরণকে ত্বরান্বিত করবে। গত কয়েক বছরে প্রাথমিক থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে কয়েক গুণ ফি বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে আমাদের আশঙ্কা সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। সেই শিক্ষানীতির উপর ভিত্তি করেই সরকার এবার শিক্ষা আইন করার উদ্যোগ নিয়েছে। ফলে এই আইনেও ছাত্রস্বার্থবিরোধী অনেক বিধান যুক্ত করা হয়েছে। তাই আমরা শিক্ষার গণতান্ত্রিক অধিকারহরণকারী এই শিক্ষা আইন বাতিলের দাবি করছি।

বক্তারা আরও বলেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সান্ধ্যকালীন কোর্স চালু ও পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের বিধান রাখা হয়েছে। যা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবে। যদিও এই প্রক্রিয়া চলমান কিন্তু আইনসঙ্গত হওয়ার ফলে তা আরও ত্বরান্বিত হবে। উচ্চশিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে সাধারণ মানুষ। বাস্তবে এই শিক্ষা আইন শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার বদলে শিক্ষার অধিকার আরও হরণ করবে। তেমনি বিদ্যমান শিক্ষার সংকটও দূরীভূত হবে না। শিক্ষা আইনে শিক্ষার সংকট দূরীকরণে কোনো স্পষ্ট নির্দেশনা নেই। প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো ঘটনায় সরকারের করণীয় কী সে বিষয়টি সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। নোট বা গাইড বই প্রকাশের ক্ষেত্রেও লঘু দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত প্রশাসনে এটাও কার্যকরী হবে কি'না সেটা সংশয়ের উর্দ্ধে নয়। সর্বোপরি এই শিক্ষা আইনে এদেশের ছাত্রসমাজের আকাঙ্ক্ষার কোনো প্রতিফলন নেই। শিক্ষার সংকট নিরসনে কার্যকর কোনো প্রস্তাবনা নেই। তাই অবিলম্বে শিক্ষার অধিকার হরণের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ ও এর উপর ভিত্তি করে প্রণীত শিক্ষা আইন বাতিল করে শিক্ষার সামগ্রিক সংকট নিরসনে জাতীয় বাজেটের ২৫ ভাগ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করতে হবে।

এ সমাজে শিক্ষকের মর্যাদা কোথায়

(শেষ পৃষ্ঠার পর) মানকে এই স্তরে নামিয়ে আনতে। ধর্মীয় উন্মাদনার প্রবল জোয়ারে গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনাকে ধসিয়ে দিতে চায়। তাই আমরা দেখি, ১৭ বছর ধরে সুনামের সাথে যে শিক্ষক শিক্ষকতা করলেন, তাঁর এমন লাঞ্ছনা-অপমানেও উপস্থিত ছাত্র-জনতা সেই সাংসদের বিরুদ্ধে কোনো ভূমিকা নিতে পারলো না।

এক চূড়ান্ত পাশবিক ও অমানবিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আমরা আজ পথ চলছি। ধর্মের নামে মানুষ খুন হচ্ছে প্রায় প্রতিদিন। তাদের কেউ হিন্দু, কেউ বৌদ্ধ, কেউবা খ্রিস্টান, এমনকি মুসলমান। লালনভক্ত বলে খুন হয়েছেন কুষ্টিয়ার একজন মুসলিম হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, বর্বরতম হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন সঙ্গীত প্রেমিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, মুক্তবুদ্ধির বিজ্ঞান-লেখক, ব্লগার, প্রকাশক এমনকি সাধারণ মুদি দোকানদার। বিভিন্ন সময়ে এসব হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করেছে আইএস, আলকায়েদার উপমহাদেশীয় শাখা বা অন্য কোনো ইসলামি জঙ্গী গোষ্ঠী। সরকার তার রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে এসব হত্যাকাণ্ডের সাথে আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততার কথা বারবারই অস্বীকার করেছে। জনগণও তাই ধোঁয়াশার মধ্যে। এসব ঘটনা কারা ঘটাচ্ছে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থাকতে পারে কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, ধর্মের নামে বর্বরতম কর্মকাণ্ড এখানে চলছে। আর এসব ঘটনার পৃষ্ঠপোষকতা করছে সেই রাজনীতি বা সেইসব রাজনৈতিক দল যারা কায়েমী স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্মকে ব্যবহার করে। তারাই গোটা দেশ জুড়ে অর্থনৈতিক শোষণ-দুর্নীতি-লুটপাটের মৃগয়া ক্ষেত্র রচনা করে, শিক্ষা-স্বাস্থ্যসহ সকল অধিকার মানুষের নাগালের বাইরে নিয়ে যায়, অশ্লীলতা-অপসংস্কৃতি ছড়িয়ে প্রতিদিন নারী নির্যাতনের পরিবেশ তৈরি করে। সেলিম ওসমানরা এমন নোংরা রাজনীতির-ই ধারক ও বাহক। এরাই সারাদেশে নিজেদের স্বার্থে ধর্মীয় উগ্রতার প্রেক্ষাপট তৈরি করছে প্রতিনিয়ত।

বাংলাদেশ আজ মহাসংকটের কাল অতিক্রম করছে। এ সংকটের প্রধান কারণ দেশে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অনুপস্থিতি। গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি সবই আজ ধুলিসাৎ। এ কারণেই দেশে আজ ধর্মকে পুঁজি করে নির্যাতন-হত্যাকাণ্ডের মতো জঘন্য অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে। এরকম সংকটময় পরিস্থিতিতে, যখন সত্য যুক্তি-ন্যায়বোধ ভুলুণ্ঠিত, তখন দেশের সকল শিক্ষিত-সচেতন মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। অন্ধকার যখন আজ গোটা জনপথকে গ্রাস করছে তখন নিশ্চুপ থাকার কোনো অবকাশ নেই। ধার্মিক মানুষদেরও এই চরম অধার্মিকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

কৃষকদের প্রতিবাদ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) এবং কৃষক ফ্রন্ট পীরগাছা উপজেলা শাখার উদ্যোগে ৩ মে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিক্ষোভ মিছিল শেষে চৌরাস্তা মোড়ে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন বাসদ (মার্কসবাদী) পীরগাছা উপজেলা সংগঠক রঞ্জন বর্মন, বক্তৃতা করেন পলাশ কান্তি নাগ, কৃষক ফ্রন্ট আরাজি ঝিনিয়া অঞ্চল কমিটির আহবায়ক নিখিল বর্মন, সদস্য সচিব নবীন বর্মন, ছাত্র ফ্রন্ট নেতা আবু রায়হান বক্‌শি।

চট্টগ্রাম, সিলেট, দিনাজপুর, গাইবান্ধাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় একই দাবিতে অনুরূপ কর্মসূচি পালিত হয়।

রেডিমেড দর্জি শ্রমিকদের ধর্মঘটের মুখে মজুরি বৃদ্ধির ঘোষণা
শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের আন্দোলনের বিজয়

রেডিমেড দর্জি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে সদরঘাটের লেডিস মার্কেট ও ইস্ট বেঙ্গল মার্কেটে গত ১৮ মে সর্বাত্মক ধর্মঘটের মুখে শার্টের সেলাই মজুরি বৃদ্ধির ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়েছে মালিকপক্ষ। প্লেন ফুল শার্ট সেলাই মজুরি ৩০ টাকা ও হাফ শার্টে ২৫ টাকা মজুরীর দাবি না মানায় শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের ডাকে অনির্দিষ্টকাল ধর্মঘট ঘোষণা করা হয়। ১৮ মে সকাল ৯টা থেকে বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকরা লেডিস মার্কেটের সামনে এসে জড়ো হয়। লেডিস মার্কেটের মূল গেট বন্ধ করে শত শত শ্রমিকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। মিছিলে-স্লোগানে শ্রমিকরা তাদের দাবির কথা জানাতে থাকে। এক পর্যায়ে মালিক পক্ষ এসে বাধা দেয়ার চেষ্টা করলে শ্রমিকদের বিক্ষোভের মুখে তারা পিছু হঠতে বাধ্য হয়। পুলিশ এসে তাদের কয়েকবার তুলে দিতে চেষ্টা করলেও শ্রমিকরা শান্তিপূর্ণ অবস্থান অটুট রাখে। অবশেষে প্রতি শার্টের সেলাই মজুরি ২ টাকা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত হয় ও ওইদিন রাত থেকে তা কার্যকরের ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণার প্রেক্ষিতে ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়।

উল্লেখ্য, শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের উদ্যোগে গত ৭ ফেব্রুয়ারি সদরঘাট থেকে পদযাত্রা করে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। গত ৬ মার্চ সদরঘাট এলাকায় মিছিল-সমাবেশ করে লেডিস মার্কেট দোকান মালিক সমিতি বরাবরে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। ধর্মঘট চলাকালে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন সূত্রাপুর থানা সংগঠক রাজীব চক্রবর্তী, ছাত্র নেতা মাসুদ রানা, দর্জি শ্রমিক নেতা আবির মাহমুদ, ইদ্রিস আলী, কালাম ব্যাপারী, মো. আনোয়ার, ইউনুস হোসেন, আফজাল হোসেন প্রমুখ।

যশোর: বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের অধিভুক্ত দর্জি শ্রমিক ফেডারেশনের নেতৃত্বে যশোরের অভয়নগর উপজেলার নোয়াপাড়ায় দর্জি শ্রমিকদের ১৫ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় গত ১৫ জুন লাগাতার ধর্মঘট শুরু হয়। ধর্মঘটে দর্জি শ্রমিকরা স্বত:স্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। ধর্মঘটের মুখে মালিকপক্ষ বাধ্য হয়ে শ্রমিকদের মজুরি ও বোনাস ১০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি করে। ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেন শ্রমিক নেতা কিশোর অধিকারী ও রিপন আহমেদ।

নারায়ণগঞ্জে শিক্ষক লাঞ্ছনা
এ সমাজে শিক্ষকের মর্যাদা কোথায়?

একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কথা মানুষ যেন ভুলতে বসেছে। দুর্বিনীত রাজনৈতিক ক্ষমতা, কাড়ি কাড়ি অর্থের দাপটের কাছে প্রতিদিন লাঞ্ছিত হচ্ছে মনুষ্যত্ব-বিবেক আর মূল্যবোধ। মানুষের প্রতি মানুষের সম্মান-শ্রদ্ধার সম্পর্কের বিপরীতে এ যেন শিষ্টের পালনে দুষ্টের শাসন। এমন-ই একটি ঘটনা ঘটেছে নারায়ণগঞ্জের পিয়ার সাত্তার লতিফ হাইস্কুলে। যেখানে মহাজোট সরকারের সাংসদ সেলিম ওসমান সাম্প্রদায়িকতার মিথ্যা অভিযোগ তুলে কান ধরে উঠবস করিয়েছেন ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তকে। শুধুমাত্র ক্ষমতার জোরে এমন নির্লজ্জ ঘটনার জন্ম দিতে পেরেছেন এই সাংসদ। একটি গণতান্ত্রিক সমাজে এমন ঘটনা কল্পনারও অতীত। দীর্ঘদিন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য লড়াই করা এদেশের সাধারণ মানুষ তাই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। প্রতিবাদ হয়েছে কিন্তু আজও বিচার হয়নি সেই অভিযুক্ত সাংসদের। বরং ঘটনার সাম্প্রদায়িক রং চড়িয়ে ইসলাম রক্ষার পক্ষ-বিপক্ষ শক্তি দাঁড় করানো হয়েছে।

লাঞ্ছিত সেই শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিলো তিনি নাকি ইসলাম ধর্ম নিয়ে কটূক্তি করেছেন। ঘটনার সাক্ষী সেই স্কুলের ছাত্র, ছাত্রের অভিভাবক এমনকি কয়েকজন শিক্ষক পর্যন্ত এই অভিযোগকে মিথ্যা বলেছেন। তাহলে কোন্ যুক্তিতে সেলিম ওসমানের সাঙ্গপাঙ্গরা এমন অভিযোগ দাঁড় করাতে পারলো? কোন্ উদ্দেশ্য থেকেই বা তারা তা করলো? নির্যাতিত শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্ত বলেছেন, '১৭ বছর ধরে ওই স্কুলে শিক্ষকতা করলেও কোনো সমস্যা হয়নি। সমস্যা হলো নতুন কমিটি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে। ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি তাঁর বোনকে এই পদে বসাতে চান।' বাস্তবে সেলিম ওসমান ওই ব্যবস্থাপনা কমিটির ইন্ধনে প্রধান শিক্ষককে অপমান করেছেন।

আজ দেশে এমন এক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যেখানে যেকোনো ধরনের অন্যায় এমনকি মানুষ হত্যা পর্যন্ত জায়েজ করার চেষ্টা হয় ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে। তাই ধর্মীয় নৈতিকতার ন্যূনতম কিছু সেলিম ওসমান ধারণ না করলেও 'ধর্ম রক্ষায়' তিনি এ কাজ করেছেন। বুর্জোয়া রাজনীতির নোংরা খেলা আর গোষ্ঠীস্বার্থে ধর্ম কীভাবে ব্যবহৃত হয়–এ ঘটনা তারই একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ধর্ম নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা মানেই কি অপরাধ? আলোচনা-তর্ক-বিতর্ক ছাড়া সত্যে উপনীত হবার আর কোনো রাস্তা আছে কি? কিন্তু বলতেই হয়, এমন একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ আমাদের দেশে নেই। যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেই, ধর্মীয় ব্যাখ্যার চেয়ে ভিন্ন কোনো আলোচনা কেউ করলো, তাহলেও কি তাকে অপমান করা যায়, শারীরিক-মানসিক নির্যাতন করা যায়? এর সাথে কি গণতন্ত্র-সভ্যতার কোনো সম্পর্ক আছে? এ তো মধ্যযুগীয় বর্বরতা। ইউরোপে মধ্য যুগে খ্রিস্টধর্মের বিরোধিতা এমনকি খ্রিস্টধর্মের সংস্কারের চেষ্টা যারা করতেন তাদের মৃত্যুদণ্ড দিয়ে পুড়িয়ে মারা হতো। সেটা ছিল অন্ধকার যুগ। মধ্য যুগের সেই অন্ধকারকে বিদীর্ণ করেই একদিন ইউরোপের দেশে দেশে কালক্রমে পৃথিবী জুড়ে চিন্তার স্বাধীনতার ধারণা এসেছিলো। 'বিশ্বাসে মেলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর' এর জায়গায় স্থান পেয়েছিলো ভলতেয়ারের সেই অমোঘ বাণী, 'What is reasonable, that is acceptable, that is truth.` অর্থাৎ পূর্বনির্ধারিত ধারণা নয়, যুক্তি আর বিজ্ঞানের কষ্ঠিপাথরে নির্ণীত হবে যেকোনো চিন্তার সত্যতা। নবজাগরণের সেই মহান ধারণাগুলো আজ কোথায়? এদেশের জন্মের ইতিহাসের সাথেও তো জনগণের বীরত্বপূর্ণ লড়াই ছিলো। কিন্তু আজ কি পরিস্থিতি? এখন এটি স্পষ্টতই প্রতীয়মান, ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এদেশের সাধারণ মানুষের ২৪ বছরের সংগ্রামের চেতনা আজ অনেকটুকু ম্লান। শাসকরাও চায় জনগণের চেতনার *(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

শিক্ষাখাতে জাতীয় বাজেটের ২৫ ভাগ বরাদ্দ ও শিক্ষা আইন বাতিলের দাবিতে শিক্ষামন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে শিক্ষাখাতে জাতীয় বাজেটের ২৫ ভাগ বরাদ্দ ও অগণতান্ত্রিক শিক্ষা আইন ২০১৬ বাতিলের দাবিতে ২ জুন দুপুর ১২ টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমাবেশ শেষে উক্ত দাবিতে শিক্ষামন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেয়া হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নাঈমা খালেদ মনিকার সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক (৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

তনু হত্যার দ্বিতীয় ময়নাতদন্তের মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর প্রতিবেদন বাতিলের দাবি বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের

তনু হত্যার বিচার, দ্বিতীয় ময়নাতদন্তের মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর প্রতিবেদন বাতিল এবং কুমিল্লা মেডিকেল কলেজের ফরেনসিক বিভাগ ও মেডিকেল বোর্ডের প্রধান কামদা প্রসাদ সাহার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ১৪ জুন বিকাল ৪ টায় প্রেসক্লাবের সামনে বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের বিক্ষোভ-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মর্জিনা খাতুন, বক্তব্য রাখেন সাংগঠনিক সম্পাদক মনিদীপা ভট্টাচার্য, অর্থ সম্পাদক তাছলিমা আক্তার বিউটি।

২০১৬ সালের মধ্যে পিইসি পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে অভিভাবকরা সোচ্চার

৬ জুন রাজধানীর আইডিয়াল স্কুলের সামনে বিক্ষোভ

২০১৬ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা (পিইসি) বাতিলের দাবিতে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা সোচ্চার। এ দাবিতে গত ৫ জুন রবিবার সকাল ৮টায় বেইলি রোডে ভিকারুন নিসা নূন স্কুলের সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন অভিভাবক আসাদুজ্জামান, সালমা আক্তার, সুফিয়া মাজহান, আনোয়ার হোসেন, মলয় সরকার প্রমুখ।

সম্পাদক : শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা- ১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭৩। ওয়েবসাইট : www.sammobad.org । ই-মেইল : mail@spbm.org